'আহলে হাদীসে'র বিভ্রান্তি ও সুন্নাতে নববীর আদর্শ

আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক

গত ২৮ মার্চ ২০১৫ খ্রি. রোজ শনিবার লালবাগ চৌরাস্তার পার্শ্বে আইম্মায়ে মাসাজিদ, উলামায়ে কেরাম ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে এক বিরাট দীনী মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে রাত ১১.০০ হতে ০১.৩০ পর্যন্ত দীর্ঘ ও সারগর্ভ বয়ানে হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. বর্তমান লা-মাযহাবীদের সৃষ্ট বিভ্রান্তিসমূহের দাঁতভাঙ্গা জবাব প্রদান করেছিলেন। মূল্যবান বয়ানটি দেশব্যাপী সকল হকপছন্দ্ ও সত্যানুসন্ধানীর হাতে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে রাবেতায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। -সম্পাদক

হামদ ও সালাতের পর,

বর্তমানে আহলে হাদীসদের দৌরাত্ম চরম পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। কুলি-মজুর, দর্জি, রিক্সাওয়ালা, সুইপার সবাই নাকি আহলে হাদীস। কী তাজ্জবের কথা! আরে *সহীহ বুখারী শরীফ* খুলে দিলে পড়তে পারবে তোমরা? দশ লক্ষ টাকা চ্যালেঞ্জ করলাম, বংশালের কোন আহলে হাদীস *সহীহ বুখারী শরীফ* পড়তে পারবে না। *সহীহ বুখারী শরীফে* যের-যবর দেয়া নেই, ওটা গ্রামার দিয়ে পড়তে হয়। তুমি তো আরবী গ্রামার পড়োনি, তোমার তো *সহীহ বুখারী* পড়ারই যোগ্যতা নেই, অথচ তুমিই কি না আহলে হাদীস! কত বড় প্রতারণা, কত বড় ধোঁকাবাজি! কয়েক দিন আগে উলামায়ে কেরাম আমাকে জানালেন, আহলে হাদীস নামক ফেরকাটি এ এলাকার মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে চলছে, মানুষকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সময় না থাকা সত্ত্বেও আমি আসতে সম্মত হয়েছি। কারণ আমার ওপর এ এলাকাবাসীর একটা হক আছে। আমি এই লালবাগ মাদরাসারই একজন ফারেগ। এখান থেকে দাওরায়ে হাদীস পড়েছি। মুফতী আব্দুল মুঈয সাহেব রহ. যিনি বাইতুল মুকাররমের খতীব ছিলেন তার কাছে দুই বছর ইফতা পড়েছি। পড়াশোনা শেষে এই মাদরাসাতেই আট বছর শিক্ষকতা করেছি। এ এলাকায় অনেক চলাফেরা হয়েছে। অনেক বছর আমি কেল্লার মসজিদের খতীব ও ইমাম ছিলাম। যা হোক, রিযিক যেখানে থাকে মানুষকে সেখানে চলে যেতে হয়। এক সময় আমার রিযিক মুহাম্মদপুর চলে গিয়েছে, আমিও মুহাম্মদপুর চলে গিয়েছি। এখন আল্লাহ সেখানে রেখেছেন। যতদিন সেখানে রিযিক আছে, থাকবো। যদি অন্য কোথাও রিযিক চলে যায় তো সেখানে চলে যেতে হবে।

তো বলছিলাম, আমার উপর এ এলাকার ভাইদের একটা হক আছে। আমি একটানা দশ বছর এ এলাকার আলো-বাতাস গ্রহণ করেছি। আজকে তারা আমাকে স্মরণ করেছে। আমি মনে করি, আমার উপর তাদের হক আছে, পাওনা আছে। এজন্য আমি তাদের ডাকে লাব্বাইক বলে সাড়া দিয়েছি। হাদীসের দরস সংক্ষেপ করে চলে এসেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই মজলিসকে কবুল করুন। আমাদের সকলকে হক বোঝার তাওফীক দান করুন এবং বাতিলের খপ্পর থেকে হিফাযত করুন।

আমি যে আয়াতটি তিলাওয়াত করেছি এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত হকের একটা রাস্তা থাকবে, পাশাপাশি বাতিলেরও অনেকগুলো রাস্তা থাকবে। আয়াতে কারীমায় হকের রাস্তা বলা হয়েছে একটি। আর বাতিল রাস্তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহুবচন ব্যবহার করেছেন। বোঝা গেল, বাতিলের অনেকগুলো রাস্তা থাকবে। অপরদিকে উলামায়ে কেরামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুই রকম দায়িত্ব দিয়েছেন। একটা হল, মুসলমানদেরকে ঈমান-আমল শিক্ষা দেয়া। অর্থাৎ জনসাধারণকে তারা ঈমানও শিক্ষা দিবে; নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল রিযিক এবং পিতা, মাতা, বিবি, বাচ্চার হকও শিক্ষা দিবে। আর অপরটা হল, এই যে বললাম, বাতিলের অনেকগুলো রাস্তা আছে, তো কখনও যদি কোন বাতিল রাস্তা প্রকাশ পায়, কোন বাতিল মুসলমানদের উপর হামলা করে তখন উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐ বাতিলের মুকাবেলা করা এবং তাকে দাফন করে দেয়া। ঠিক যেমনটি হাদীসে পাকে এসেছে—

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

এ হাদীসে বলা হয়েছে, হক্কানী উলামায়ে কেরাম এবং আল্লাহওয়ালাগণ কয়েকটি কাজ করবে। তার মধ্যে একটি হল, تحريف الغالين অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে যারা বাড়াবাড়ি করবে, তাদেরকে তারা প্রতিহত করবে। এখন আমাদেরকে জানতে হবে, বর্তমানে দীনের ব্যাপারে কারা বাড়াবাড়ি করছে। এই যে মাজার পূজারী এবং মিলাদ-কিয়ামকারীরা যারা বলে, কিয়াম না করলে কাফের হয়ে যায়— এরা হল বাড়াবাড়িকারী। কিয়াম না করলে মানুষ কাফের হবে কেন? দুরূদ তো দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে শুয়ে এমনকি হাঁটা-চলা অবস্থায়ও পড়া যায়। নামাযে তো বসে বসেই দুরূদ পড়তে হয়। আর নামায হল সর্বোত্তম আমল। তাহলে বোঝা গেল, দুরূদ শরীফ বসে পড়া উত্তম। এখন কথা হল, দুরূদ পড়তে পড়তে এরা হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায় কেন? তারা বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আগমন করেন, তাই আমরা দাঁড়িয়ে যাই। তা ওরা কীভাবে দেখল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের মিলাদ মাহফিলে আগমন করেছেন!? এটা ভণ্ডামী বৈ কিছু নয়। তো এটা একটা বাতিল ফিরকা। এই বাতিল ফিরকার মূল ব্যক্তি ছিল আহমদ রেযা খান। এই লোকটিকে ইংরেজরা খরিদ করে নিয়েছিল। ইংরেজরা তাদের শাসনামলে চারজন লোককে খরিদ করেছিল। তাদের মধ্যে এ-ও একজন। এরা কথায় কথায় মানুষকে কাফের বানায়। যেমন, দেওবন্দী উলামায়ে কেরাম কাফের, আশরাফ আলী থানবী কাফের, রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী কাফের। (নাউযুবিল্লাহ)। যাদের সম্পর্কে আহলে কাশফ বুযুর্গানে দীন বলেছেন, আকাবিরে দেওবন্দের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পথচলার যোগ্যতা ছিল। আল্লাহ তা'আলা শেষ যামানার লোকদের সামনে পূর্বের যামানার লোকদের ঈমান-আমল প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে পরে পাঠিয়েছেন— অথচ তারা সবাই এদের দৃষ্টিতে কাফের! আল্লাহ আমাদেরকে

দায়িত্ব দিয়েছেন যে, তোমরা কাফেরদেরকে মুসলমান বানাও। আর এই লোকগুলো সব মুসলমানকে কাফের বানিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশে এই দলটির নাম রেজভী। আর পাকিস্তানে এদের নাম বেরেলভী। এরা মাজার পূজারী, জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনকারী। তো এরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে।

আরেকটা দল যারা বাড়াবাড়ি করে তারা আহলুল হাদীস নামে পরিচিত। পৃথিবীতে চারটা মাযহাব মিল মুহাব্বতের সাথে বিদ্যমান আছে। জেদ্দা কোন সাগরের তীরে অবস্থিত? লোহিত সাগর। ইংরেজিতে বলা হয় রেড সী। ঐ সাগরের পশ্চিম দিকে যত দেশ আছে, আলজেরিয়া নাইজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মৌরতানিয়া, মরক্কো এসব এলাকার লোকজন মালেকী মাযহাব মেনে চলে। আরব ভূখণ্ডে বর্তমানে হাম্বলী মাযহাব প্রচলিত। এশিয়া মহাদেশের মানুষ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দীন পালন করে। হানাফী মাযহাবের লোক দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি। ওদিকে ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়ায় আছে শাফেয়ী মাযহাব। তো পুরা দুনিয়ার মুসলমানগণ মাযহাব মেনে চলে। মাযহাব ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঈমানের প্রশ্নে এরা সকলেই একাট্টা। এই শুধু আমীন জোরে বলবে না আস্তে বলবে– এ জাতীয় সামান্য কিছু পার্থক্য এদের মধ্যে বিদ্যমান। এদের প্রত্যেকের আমলের ওপর কুরআন-সুন্নাহর দলীল আছে। এদের কেউই ভুলের ওপর নয়। চারও মাযহাব হক ও সঠিক। চারও মাযহাবকে সহীহ ইসলাম বলতে হবে। বলুন, চারও মাযহাবকে কী বলা হবে? সঠিক ইসলাম। আমরা মিল মহব্বতের সাথে ছিলাম। কেউ কাউকে কাফের বলিনি। কেউ কাউকে অযোগ্য বলিনি। আমাদের এই মিল মহব্বত ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা লোটার জন্য ইংরেজরা একটা ফেরকার জন্ম দিলো। যার মাধ্যমে তারা এ কাজটি করাল তার নাম ছিল মুহাম্মদ হুসাইন বাটালবী। ইংরেজরা তাকে খরিদ করে নিয়েছিল। এই ব্যক্তি আহলুল হাদীস নামটা ইংরেজ গভর্ণর থেকে পাস করিয়ে নিয়েছিল। তারা চারও মাযহাবের অনুসারীদেরকে বলে, তোমরা মুশরিক হয়ে গেছো। তোমরা যে ইমাম মানছো এটা শিরক। মাযহাব মেনে তোমরা শিরক করছো। তোমরা সবাই কাফের হয়ে গেছো। তো এদের ভাষ্যমতে পুরা দুনিয়ার মুসলমানরা কাফের হয়ে গেছে। আর ঈমানদার শুধু এরা ১০/১৫ জন। এটা হয়!? সেই আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান চার মাযহাবে বিভক্ত। এরা সবাই কাফের? আর এরা কয়েকজন শুধু মুমিন? সবাইকে কাফের বানানোর এই ঠিকাদারী তাদেরকে কে দিয়েছে? তারা সবাইকে কাফের বলছে, এটা কি ধর্মের নামে বাড়াবাড়ি নয়?

শরীয়তে দলীল কয়টা? চারটা। যে কোন তালেবে ইলমকে জিজ্ঞাসা করুন। প্রত্যেকটি কিতাবেই আছে শরীয়তের দলীল চারটি। সেগুলো হল, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস। এরা ইজমা ও কিয়াসকে শরীয়তের দলীল মানে না। অথচ ইজমা, কিয়াসের শরয়ী দলীল হওয়া কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। তারা বলে, আমরা শুধু কুরআন হাদীস মানি। আচ্ছা কুরআন যখন মানো তাহলে কুরআনের সবকিছু কি মানতে হবে না? না কি নিজেদের মন মতো দু চারটা আয়াত মানলেই হবে? কুরআন তো আমাদের ইজমা মানতে বলেছে। আমি দলীল পেশ করব যে, কুরআন আমাদেরকে ইজমা মানতে বলেছে। হাদীস বিশারদদের একটা দল যারা কুরআন হাদীসের আলোকে মাসআলা বের করতে পারে, তাদেরকে বলা হয় ফকীহ। সব হাদীস বিশারদই ফকীহ হন না। হাদীস বিশারদ হওয়ার পাশাপাশি যাদের মধ্যে কুরআন হাদীসের বর্ণনা থেকে মাসআলা-মাসাইল আবিষ্কার করার যোগ্যতা থাকে তারা হলেন ফকীহ।

তো বলছিলাম, মাযহাব মানার বিষয়টা অর্থাৎ ইজমা কিয়াস মানার বিষয়টা এটা কুরআন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আহলুল হাদীসরা ইজমাও মানে না, কিয়াসও মানে না। চার দলীলের দুটি না মেনে এরা অর্ধেক ইসলামকেই অস্বীকার করছে। বলুন, এতে কি তারা ঈমানদার হতে পারবে? আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ.

অর্থ : তোমরা অর্ধেক মানো আর অর্ধেক মানো না এতে তোমরা মুমিন হতে পারবে না। (সূরা বাকারা- ৮৫)

বলুন! পুরা কুরআন মানতে হবে, নাকি অর্ধেক মানলেই হবে? তারা কুরআনে বর্ণিত ইজমার আয়াত, কিয়াসের আয়াত মানছে না। আর আমরা মানি বলে আমাদেরকে বলে মুশরিক। আমরা আয়াতগুলো মেনে মুশরিক হলাম আর তারা না মেনে ঈমানদার হলো? (নাউযুবিল্লাহ)। তো এই রেজভী আর আহলুল হাদীসদেরকে আলোচ্য হাদীসে বাড়াবাড়িকারী বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বাড়াবাড়িকারীদেরকে প্রতিহত করা হক্কানী উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব।

উলামায়ে কেরামের দ্বিতীয় দায়িত্বটি হচ্ছে انتحال المبطلين অর্থাৎ বাতিল পন্থীদেরকে বাতিল ঘোষণা করা। হাদীসে এসেছে বাতিল পুরোটাই বাতিল। আমাদের যুগে বাতিল কারা? কাদিয়ানিরা অর্থাৎ যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী না মেনে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী মানে। আরেক দল বাতিল হল শিয়ারা। অর্থাৎ এরাও কাফের। শিয়ারা আমাদের এই কুরআনকে অরিজিন্যাল কুরআন মনে করে না। তারা বলে, অরিজিন্যাল কুরআনে ১৭ হাজার আয়াত থাকবে। আর আমাদের কুরআনে আছে ৬ হাজার ২ শত ৩৬ টি আয়াত। তো শিয়ারা বলছে, আমাদের এই কুরআন অরিজিন্যাল নয়। অরিজিন্যালটা নাকি তাদের বারোতম ইমামের কাছে আছে। প্রশ্ন হল, তাদের সেই ইমাম অরিজিন্যাল (?) কুরআন নিয়ে কোথায় আছেন? শিয়াদের এক গ্রুপ বলছে, তিনি মেঘের মধ্যে আছেন। আরেক গ্রুপ বলছে, ইরাকের 'সুররা মান রআ' নামক একটা পাহাড়ের গুহায় তিনি লুকিয়ে আছেন। পুরা এলাকায় যখন শিয়াদের শাসন কায়েম হবে তখন তিনি বের হবেন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ শিয়া। ইরাকের ক্ষমতাও এখন শিয়াদের হাতে। এজন্য শিয়ারা পুরা ইরাক তাদের দখলে আনতে চাচ্ছে। লেবাননের হিজবুল্লাহ গ্রুপ শিয়াপন্থী। এরা কেউই বর্তমান কুরআন মানে না। কুরআনে আম্মাজান আয়েশাকে পবিত্র বলা হয়েছে। আর তাদের কিতাবে আছে, তারা ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে পারলে মা আয়েশাকে কবর থেকে উঠিয়ে ১০০ ঘা বেত মারবে, (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি নাকি (নাউযুবিল্লাহ) যিনা করেছিলেন। কুরআন যেখানে আয়াত নাযিল করে বলে দিল যে, ঘটনাটি নিতান্তই জঘন্য একটা অপবাদ এবং এটা মুনাফিকদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা– সেখানে তারা বলছে, এটা সত্য নয়, বরং আয়েশা সত্যি সত্যিই অন্যায় করেছে। তো এরপরও তারা কীভাবে কুরআন মানলো এবং

এরপরও তারা কীভাবে মুসলমান থাকে? কুরআনের একটা আয়াত কিংবা অর্ধেক আয়াত অস্বীকার করলেও কারো ঈমান থাকে? তো হাদীসের ইনতিহালুল মুবতিলীনের মধ্যে কাদিয়ানী আর শিয়ারা অন্তর্ভুক্ত। উলামায়ে কেরামকে এই উভয় পক্ষের মুকাবেলা করে তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে।

হাদীসের পরবর্তী অংশ وتاويل الجاهلين তাবিল মানে হল, তাফসীর। আর জাহেল মানে যার তাফসীর করার যোগ্যতা নেই।

তাফসীর করতে হলে পনেরটা সাবজেক্টে জ্ঞান থাকতে হবে। পনেরটা সাবজেক্টে জ্ঞান থাকলে সে তাফসীর করতে পারে। আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোতে, দেওবন্দী মাদরাসাগুলোতে ঐ পনেরটা বিষয়কে ধাপে ধাপে পড়ানো হয়। যাতে প্রতিটি ছাত্রের মধ্যেই কুরআনের তাফসীর বোঝার ও তাফসীর করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। দেওবন্দী মাদরাসার সিলেবাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেলেন তো!? যে পনেরটা বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে তাফসীর বোঝা যায় না, যেমন: নাহব, সরফ, ইশতিকাক, বয়ান, মা'আনী, বদী, কিরাআত, লুগাত, কাসাস, নাসেখ-মানসূখ, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ ইত্যাদি শাস্ত্রে যার দক্ষতা নেই সে যদি তাফসীর করে তাহলে তাকে কী বলা হবে? জাহেলদের তাফসীর। তো আমাদের আলোচ্য হাদীসের মর্ম ও প্রয়োগক্ষেত্র কিন্তু প্রত্যেক যামানায়ই পাওয়া যাবে। আমদের যামানায় تاويل الجاهلين কথাটা পাওয়া যাচ্ছে দুজন ব্যক্তির মধ্যে। একজন হল জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার মওদুদী সাহেব। তিনি তাফহীমুল কুরআন নামে একটি বই লিখেছেন। আর বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক যে তাফসীর করছে এটাও হাদীসে বর্ণিত জাহেলদের তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত। জাকির নায়েক একজন অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার। তাফসীর করার কোন অধিকার তার নেই। তিনি কেন ফতওয়া দিতে যাবেন? ফতওয়া দেয়া তো আমার বা আমাদের কাজ। লালবাগে আমি আট বছর ফতওয়া দিয়েছি। আমার কাজ যদি কোন ডাক্তার সাহেব ছিনিয়ে নেয় তাহলে আমি সেই ডাক্তারকে বলব, আপনার পেটে টিউমার হলে কিন্তু আমি মুফতী সাহেব সেটার অপারেশন করব। আপনি ডাক্তার হয়ে যদি ফতওয়া দিতে পারেন যেটা আপনার কাজ নয়, তাহলে আমি মুফতী সাহেব হয়ে কেন আপনার পেট কাটতে পারবো না? আপনারা এসব জাকির নায়েকদেরকে বলুন, তোমাদের অসুখ হলে পেট কাটবে কিন্তু আমাদের মুফতী সাহেব। তখন হয়তো তাদের হুঁশ ফিরবে।

মোটকথা আলোচ্য হাদীসে উলামায়ে কেরামকে তিন ধরনের ফেরকা প্রতিহত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথম প্রকার হল রেজভী ও আহলুল হাদীস। দ্বিতীয় প্রকারে আছে কাদিয়ানী ও শিয়া। আর তৃতীয় প্রকারে আছে মওদুদী ও জাকির নায়েক সাহেব। বর্তমানে এই ছয়টি ফেরকাকে মুকাবেলা করা এবং এদের সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করা প্রত্যেক আলেমের ঈমানী দায়িত্ব। এ ব্যাপারে আমাদের আলেম সমাজকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আমরা আলেমরা যদি মুখ না খুলি, ভয় পাই তাহলে আমরা কিসের ওয়ারিসে আম্বিয়া হলাম। আমাদের জীবন তো আল্লাহর জন্য ওয়াকফকৃত। আল্লাহর জন্য জান দিতে হলে প্রয়োজনে শহীদ হব। আশ্চর্যের কী? হায়াত থাকতে কেউ কোনদিন মরে। তাহলে ভয় কিসের? আল্লাহর দীনের কথা বলবো, হক কথা বলবো। হক কথা না বললে জনগণ কি বাতিল ফেরকার খপ্পরে পড়ে ঈমান নষ্ট করবে না? তারা ঈমান নষ্ট করবে এবং হাশরের ময়দানে উলামায়ে কেরামকে দোষী সাব্যস্ত করবে যে, ইয়া রাব্বাল আলামীন! আমাদের এলাকায় বড় বড় আলেম ছিল, বড় বড় মাদরাসা ছিল। কিন্তু বাতিল যে ইসলামের দুশমন এসব আলেম আমাদেরকে তা খুলে খুলে বলেনি। তো হাশরের ময়দানে ওরা আমাদেরকে দোষারোপ করবে। সেই দোষারোপ থেকে বাঁচতে হলে বাতিলের মুখোশ উন্মোচন করে জনগণকে বাতিল চিনিয়ে দিতে হবে যে, এরা ইয়াহুদীদের এজেন্ট; ঈমান বিনষ্টকারী। এ গুরু দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই উলামায়ে কেরাম আমাদেরকে আজ ডেকেছেন। গোটা লালবাগের ইমাম সাহেবগণ ও লালবাগ মাদরাসার শিক্ষকগণ মিলে আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিয়েছেন। আশা করি এতক্ষণে আপনারা আজকের মাহফিলের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পেরেছেন।

এখন এসব বাতিলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পালা। তো যে ছয়টা বাতিলের কথা আপনাদেরকে বললাম– রেজভী, আহলুল হাদীস, শিয়া, কাদিয়ানী, মওদুদী ও জাকির নায়েক এগুলোর প্রত্যেকটার পুরোপুরি ব্যাখ্যা দিতে গেলে অনেক সময়ের প্রয়োজন। আজকে আমাদের মূল এজেন্ডা হল, তথাকথিত আহলুল হাদীসদের মুখোশ উন্মোচন। এজন্য আমি আল্লাহ প্রদত্ত ইলম অনুযায়ী শুধু এ ব্যাপারেই কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রথম কথা হল, ওরা নিজেদেরকে আহলুল হাদীস বলে পরিচয় দেয়। আর আমরা আমাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বলে ব্যক্ত করি। এখানে দুটি বিষয় আমাদের সামনে আসল। একটি হল, আহলে হাদীস আরেকটি হল আহলে সুন্নাত। কাজেই আমাদেরকে জরুরী ভিত্তিতে হাদীস আর সুন্নাতের পার্থক্য বুঝতে হবে। এই ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার আগে এই পার্থক্য না বুঝলেও চলত, কিন্তু এখন আর না বুঝলে চলবে না। এখন আপনি আলেম হোন বা না হোন বাধ্যতামূলকভাবেই হাদীস কী আর সুন্নাত কী তা আপনাকে জানতে হবে। খুব সংক্ষেপে বলব, আপনারা খেয়াল করে বুঝে নিবেন।

হাদীস কাকে বলে? হাদীস হল সাগর মহাসাগর তুল্য। আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াতের তেইশ বছরে যা বলেছেন, যা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যেসব কাজ তিনি সমর্থন করেছেন এই সবকিছুকেই হাদীস বলে।

তাহলে সুন্নাত কাকে বলে? সুন্নাত হল এই সাগরের একটা অংশবিশেষের নাম। প্রশ্ন হল সেটা কোন অংশ? মনে করুন হাদীসের এই মহাসমুদ্র থেকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. দশ লক্ষ হাদীস জানতেন। ইমাম বুখারী রহ. ছয় লক্ষ হাদীস জানতেন। এসব হাদীস থেকে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী বাছাই করে কিছু সংখ্যক হাদীস তারা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তো তাদের জানা এবং লিখা এই লক্ষ লক্ষ হাদীসের সবগুলোই সুন্নাত নয়। সুন্নাত হল ঐ সকল হাদীস যেগুলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য অর্থাৎ আপনার আমার আমলের জন্য বলেছেন। যেগুলো তিনি আপনার আমার জন্য বলেননি, কিন্তু হাদীসের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে সেগুলোকে সুন্নাত বলা হবে না। উদাহরণত হাদীসের সব কিতাবেই আছে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে এগারোটি বিবাহ করেছিলেন। এ বর্ণনাটি হাদীসের সব কিতাবেই আছে। তো সব হাদীসের কিতাবেই যেহেতু এটা আছে সেহেতু এটা একটা হাদীস। কিন্তু

তিনি কি আমাদেরকে এ হাদীসের ওপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন? দেননি। তিনি আমাদেরকে শর্ত সাপেক্ষে সর্বোচ্চ চারটির অনুমতি দিয়েছেন, এগারোটির দেননি। তাহলে এগারো বিবির আলোচনা সংবলিত বর্ণনাটি নিঃসন্দেহে হাদীস, কিন্তু সুন্নাত নয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমালে তাঁর উযূ নষ্ট হতো না। এটা হাদীস এবং তা বহু কিতাবে আছে। কিন্তু আমরা ঘুমালে কি উযূ থাকবে? থাকবে না। তো এটাকে হাদীস বলা যাবে কিন্তু সুন্নাত বলা যাবে না। পক্ষান্তরে সর্বোচ্চ চার সংখ্যক বিবাহ কর, এটা হাদীসও আবার সুন্নাতও। এটা কুরআনেও আছে, হাদীসেও আছে। 'যে ব্যক্তি চিৎ হয়ে বা কাত হয়ে ঘুমাল, তার উযূ ভেঙ্গে গেল।' এটা হাদীস এবং সুন্নাত। রাসূলের তো চিৎ বা কাত হয়ে ঘুমালে উযূ ভাঙেনি, কিন্তু আপনার আমার ভাঙবে। হাদীসের কিতাবে আছে তাই এটা হাদীস। আর আপনার আমার জন্য বলেছেন তাই এটা সুন্নাত। তাহলে দেখা গেল, কোন হাদীস সুন্নাত হওয়ার জন্য এক নম্বর শর্ত হল, বর্ণনাটি উম্মতের জন্য হতে হবে। যেটা নবীজীর জন্য নির্দিষ্ট বা কোন সাহাবীর জন্য নির্দিষ্ট সেটা শুধুই হাদীস; সুন্নাত নয়। গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করার অনুমতি হযরত আলী রা. এর জন্য নির্দিষ্ট। এ কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু আপনার আমার জন্য কি এর অনুমতি আছে? নেই। তাহলে এ অবস্থায় মসজিদে প্রবেশের অনুমতি না থাকার হাদীসটি সুন্নাত। আর আলী রাযি. যে প্রবেশ করতে পারতেন ওটা হাদীস; সুন্নাত নয়।

কোন হাদীস সুন্নাত হওয়ার দুই নম্বর শর্ত হল, সেটা রহিত না হতে হবে। ইসলাম একদিনেই পূর্ণতা লাভ করেনি। পর্যায়ক্রমে আস্তে আস্তে দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন নামাযের মধ্যে কথা বলা যেতো। লোকেরা এসে জিজ্ঞেস করত, ভাই সাহেব! নামায কত রাকাআত হয়েছে? নামাযী উত্তর দিত, দুই রাকাআত বা তিন রাকাআত। উত্তর জেনে প্রশ্নকারী আগে একা দুই বা তিন রাকাআত পড়ে নিত, তারপর জামাতে শরীক হয়ে যেত। এটা হাদীসের কিতাবে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি এখন এরূপ করা চলবে? ওরা বলে তারা নাকি সহীহ হাদীস মানে। এ বর্ণনা তো সহীহ হাদীসেও আছে। কিন্তু সহীহ হাদীসে থাকলেই কি এখন তা মানা যাবে? দেখতে হবে না, নিয়মটি বাদ হয়ে গেছে নাকি বহাল আছো?

সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসে আছে- তোমার ইমাম যদি কোন ওজরের কারণে বসে নামায পড়ায় তোমরা সবাই বসে ইকতিদা করো। এই হাদীস সহীহ বুখারী শরীফের ছয় জায়গায় আছে।

وان صلى جالسا فصلى جلوسا اجمعون

অর্থ : তোমাদের ইমাম যদি বসে নামায পড়ায় তুমিও বসে নামায পড়। কিন্তু এটা এখনো বহাল আছে, না রহিত হয়ে গেছে? রহিত হয়ে গেছে। কীভাবে বুঝা গেল? নবীজী ইন্তিকালের আগে অসুস্থাবস্থায় এক ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেছেন। তিনি বুধবার ইশার সময় অসুস্থ হয়েছেন আর সোমবার দুপুরে ইনতিকাল করেছেন। এর মধ্যে একদিন যোহরের নামাযে গিয়েছেন। বসে নামায পড়িয়েছেন। আওয়াজ এত দুর্বল ছিল যে, আবু বকর সিদ্দীককে মুকাব্বির হিসেবে তাকবীর দেয়ার জন্য নিজের পাশে রেখেছেন। প্রথম কাতারে দাঁড় করাননি। অসুস্থতার দরুন আওয়াজ এত হালকা ছিল যে, প্রথম কাতারের মুসল্লিরাও শুনতে পাবে না। তাই তাকে পাশে দাঁড় করিয়েছেন। ঐদিন নবীজী বসে বসে নামায পড়িয়েছেন, আর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার ইকতিদা করেছেন। তাহলে সহীহ বুখারীর ঐ হাদীস যা কিতাবের ছয় জায়গায় এসেছে যে, ইমাম বসে নামায পড়লে তোমরাও বসে নামায পড়। এটা কি আছে, না রহিত হয়ে গেছে? রহিত হয়ে গেছে। এই হাদীসকে কি এখন সুন্নাত বলা যাবে, বুঝেশুনে উত্তর দিন? এখানে সহীহ বুখারীর ক্লাস নিচ্ছি। এটা কোন ওয়াজ মাহফিল নয়। সহীহ বুখারীর ক্লাস সংক্ষিপ্ত করে এখানে এসেছি তাই আপনাদেরকেও সহীহ বুখারী পড়াচ্ছি। তো উত্তর কী হল, এটা হাদীস বটে কিন্তু সুন্নাত নয়। সুন্নাত হতে হলে শর্ত হল হাদীসটি রহিত না হতে হবে। এমন বহু হাদীস রহিত হয়ে গেছে। ইসলামের শুরু যামানায় নবীজী বলেছিলেন, তোমরা যদি বিবির কাছে যাও আর তার সঙ্গে সবকিছুই হয় শুধু বীর্যপাত না হয়, তাহলে তোমাদের গোসল করা লাগবে না। কিন্তু এটা কি এখনো বহাল আছে? নেই। সব কর্মকাণ্ড শেষ করল, শুধু একটু বাকী রাখল তাতেই গোসল মাফ হয়ে যাবে? যাবে না। অন্য হাদীসে দেখেন, আম্মাজান আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত,

اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا.

অর্থ : স্বামী-স্ত্রীর খতনার স্থান যদি একত্রিত হয় তবে গোসল ফরয হয়ে যাবে (আরব দেশে নারীদেরকেও খতনা করানো হয়।) মা আয়েশা রাযি. বলেন, আমার এবং রাসূলের মধ্যে এমটি হয়েছিল তখন আমরা গোসল করে নিয়েছি। তাহলে বীর্যপাতবিহীন সহবাসে গোসল ফরয না হওয়ার বিধানটি এই হাদীস দ্বারা বাদ হয়ে গেল। তবে আপনারা নিজেরা সহীহ বুখারী শরীফ রিসার্চ করতে যাবেন না। গেলে বিপদে পড়বেন। আপনারা সুন্নাতের কিতাব পড়বেন। সুন্নাত আর ফিকহ একই জিনিস। ফিকহের মধ্যে হাদীসসমূহ থেকে বাছাই করে করে সুন্নাতগুলো এক জায়গায় জমা করা হয়েছে। সহীহ বুখারী তো হাদীসের কিতাব। এখানে সুন্নাতের সঙ্গে রহিতগুলোও লেখা আছে। নবুওয়াতের তেইশ বছরের অনেক কিছু সহীহ বুখারীতে আছে। একটু আগে আমি যে হাদীসটি বললাম যে, সবকিছু হওয়ার পরও বীর্যপাত না হলে গোসল করা লাগবে না, এটা সহীহ বুখারীতে দুই জায়গায় আছে। তো আপনারা যদি একা একা সহীহ বুখারী পড়েন তাহলে এই হাদীস দেখে তো আপনারা আর ঐ অবস্থায় গোসল করবেন না। কারণ আপনারা বুঝবেন না যে, এটা রহিত হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে অনেকগুলো উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম যে, হাদীসের কিতাবে থাকা সত্ত্বেও অনেক হাদীসের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সেগুলোকে হাদীস তো বলা যাবে, কিন্তু সুন্নাত বলা যাবে না।

তিন নম্বর শর্ত : বর্ণিত হাদীসের বিধানটি ওযরবশত না হতে হবে। ওযর আপত্তি বুঝেন তো। কোন কোন কাজ নবীজী সাময়িক ওযরের বা অসুবিধার কারণে করেছেন। ওটা হাদীসের কিতাবে আছে। ওটাকে হাদীস বলতে পারবেন। কিন্তু ওটা সুন্নাত নয়। যেমন, একবার রাসূলের কোমরে ব্যথা হয়েছিল। ফলে তিনি বসতে পারতেন না। এ সময় তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। এর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে তিনি বসে পেশাব করতে তাগিদ দিয়েছেন। কাজেই এ কথা বলা যাবে না যে, সহীহ বুখারী শরীফে দাঁড়িয়ে পেশাব করার হাদীস আছে কাজেই দাঁড়িয়ে পেশাব করা সুন্নাত। হ্যাঁ সহীহ বুখারীতে থাকা সত্ত্বেও এটাকে সুন্নাত বলা যাবে না। কারণ নবীজী তা সাময়িক অসুবিধার কারণে করেছেন।

চার নম্বর শর্ত : কিছু কিছু কাজ নবীজী বৈধতার সীমানা বোঝানোর জন্য

করেছেন। যেমন তিনি তার এক নাতিকে কাঁধের উপর নিয়ে নামায পড়েছেন। সে একা একাই নবীজীর কাঁধে চড়ে যেত আবার একা একাই নেমে যেত। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক হাত দিয়ে সাপোর্ট দিয়েছেন। এটা সহীহ বুখারী শরীফে আছে। সহীহ বুখারীর দ্বিতীয় পারার শেষ পৃষ্ঠায় আছে। তো এটা হাদীস, না সুন্নাত? নিশ্চয় হাদীস। একজন নামাযী ব্যক্তি নামাযে কতটুকু করলে তার নামায নষ্ট হবে না তার সীমানা বর্ণনা করার জন্য নাতিকে কাঁধে নিয়ে তিনি নামায পড়েছেন। এটা হাদীস, কিন্তু সুন্নাত হতে পারে না। যদি সুন্নাত হত তাহলে তো আরো অনেকবার তিনি নাতি কাঁধে নিয়ে নামায পড়াতেন। তাহলে হাদীসের ভাণ্ডার থেকে কোন হাদীসকে সুন্নাত বলা হবে?

১. হাদীসের বিধানটি উম্মতের জন্য হতে হবে।

২. হাদীসটি রহিত হয়নি।

৩. হাদীসে বর্ণিত কাজটি ওযর বা অসুবিধা বশত করেননি।

৪. জায়েযের সীমারেখা বর্ণনা করার জন্য করেননি।

এই শর্তগুলো যে হাদীসে পাওয়া যাবে সেগুলো হল সুন্নাত। মোট কথা, এতক্ষণের আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হল, নবীজী বর্ণিত প্রতিটি সুন্নাতই হাদীস, কিন্তু প্রতিটি হাদীস সুন্নাত নয়। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সব নির্দেশনাতেই আমাদেরকে সুন্নাত মানতে বলেছেন। কোথাও তিনি আমাদেরকে হাদীস মানতে বলেননি। উদাহরনত তিনি বলেছেন,

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

কী বলেছেন এখানে? সুন্নাত।

من تمسك بسنتي عند فساد امتي...

এখানে কী আঁকড়ে ধরতে বলেছেন? সুন্নাত।

من احيى سنة من سنتي فكأنما احياني... من أحب سنتي فقد أحبني ...

এখানে কী আছে? সুন্নাত।

لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله.

এখানে কী আছে? সুন্নাত।

تمسكم بسنتي خير من احداث بدعة.

কী আছে এখানে ? সুন্নাত।

من أكل طيبا وعمل بسنة ... بوائقه دخل الجنة.

তো অনেকগুলো হাদীস পেশ করলাম, এগুলোর সব কটিতেই সুন্নাত অনুসরণের ও আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি কোন বানোয়াট কথা বলছি না। আহলুল হাদীস ভাইদের বলছি, দয়া করে আপনারা এমন একটা হাদীস দেখান যেখানে নবীজী উম্মতকে হাদীস অনুসরণ করতে বলেছেন।

হ্যাঁ, নবীজী বলেছেন, হাদীস বয়ান করো। বয়ান করে দেখো তা সুন্নাত হয় কি না? হলে মানবে। তাছাড়া নবীজী হাদীস বয়ান করতে বলেছেন, আমল করতে বলেনি। আমল করতে বলেছে সুন্নাতের ওপর। এক জায়গায় নবীজী উম্মতকে সতর্ক করে বলেছেন,

يكون في اخر الزمان دجالون كذابون

অর্থ : শেষ যামানায় বহু ধোঁকাবাজ বের হবে। যারা তোমাদেরকে হাদীস পড়ে পড়ে শুনাবে।

ما لم تسمع انتم ولا أبائك

যে হাদীস তোমরাও শোননি তোমাদের বাপ দাদারাও শোনেনি।

فإياكم وإياهم

তাদের থেকে দূরে থাক।

لا يضلونكم

যাতে তারা তোমাদেরকে গোমরাহ করতে না পারে।

এই যে নবীজী উম্মতকে সতর্ক করলেন যে, ভবিষ্যতে কিছু দাজ্জাল বের হবে। যারা হাদীস বয়ান করে করে তোমাদেরকে গোমরাহ করবে। এই হাদীসে যাদের ব্যাপারে নবীজী সতর্ক করেছেন এরা কারা? এরাই তো আহলুল হাদীস।

অসংখ্য হাদীসে কাযা নামাযের বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, তা পড়তে হবে। আর এরা বলছে, কাযা নামায বলে কিছু নেই। যেগুলো পিছনে কাযা হয়ে গেছে শুধু তওবা করে নিলেই না কি মাফ পাওয়া যাবে। অথচ খন্দকের যুদ্ধে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একসঙ্গে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল। নবীজী সেগুলো একসঙ্গে কাযা পড়ে নিয়েছেন। নবীজী নিজে কাযা পড়েছেন আর ওরা বলছে, কাযা নামায নেই। এমন হাদীস আপনারা কোন সময় শুনেছেন? শোনেননি। তাহলে হাদীসের সাথে মিলছে কি না? ওরা আরও বলে, পুরুষ নামাযীকেও বুকে হাত বাঁধতে হবে। এটা কী এর আগে কেউ শুনেছে? নতুন কথা না? তারা প্রচার করছে, একসঙ্গে তিন তালাক দিলে এক তালাক পতিত হয়। আপনারা ওদের হোটেলে গিয়ে তিন প্লেট ভাত খেয়ে এক প্লেটের দাম দিবেন। যদি জিজ্ঞেস করে তিন প্লেট খেয়ে এক প্লেটের দান দিচ্ছেন কেন? বলবেন, তিন তালাকে যেহেতু এক তালাক হয় তাই এক প্লেটের দাম দিচ্ছি।

অথচ ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী শরীফে 'তিন তালাক দিলে তিন তালাকই পড়বে।' বলে শিরোনাম লিখে তার প্রমাণে পরিষ্কার দলীল বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদীস এসেছে, নবীজী তার সাথে দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করেছেন।

وكان يدى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেছেন, নবীজী দুই হাত দিয়ে মুসাফাহা করলেন। আর আহলে হাদীসরা মুসাফাহা এক হাত দিয়ে করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে আবু হুমাইদ আসসায়েদী থেকে হাদীস এসেছে, তিনি একদল সাহাবীকে নবীজীর মত নামায পড়ে দেখালেন এবং সে সময় পুরো নামাযে একবারমাত্র হাত তুললেন। আহলে হাদীসরা কী নামাযে একবার হাত তোলে? শুরুতে একবার, রুকুতে যাওয়ার সময় একবার, উঠার সময় একবার। তো এরা সহীহ হাদীস মানলো? সহীহ বুখারী মানলো? সব তো সহীহ বুখারীর উল্টো করছে। তো বলছিলাম, তারা এমন এমন হাদীস বলবে যা তোমরাও শোননি তোমাদের বাপ দাদারাও শোনেনি। তাদের থেকে দূরে থাকবে। হাদীসে বণিত সেই ফেরকাই হল বর্তমানের আহলুল হাদীস। হাদীস আর সুন্নাতের পার্থক্য বুঝে থাকলে এবার বলুন একজন মুমিনের জন্য কোন নামটা যুক্তিসঙ্গত; আহলুল হাদীস না কি আহলুস সুন্নাহ। তো আমরা সুন্নাত মানবো। সার কথা আমরা সুন্নাত মেনে চলবো এবং সুন্নাতের ওপর আমল করবো।

(চলবে ইনশাআল্লাহ)

পরিচিতি : শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা। বিশিষ্ট খলীফা, মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ.

শিক্ষার জন্য শিক্ষকের বিকল্প নেই

মাওলানা জাহিদুল ইসলাম

আল্লাহ তা'আলা সকল নর-নারীর জন্য ইলম অর্জন ফরজ করেছেন। ইলম আল্লাহ তা'আলার একটি সিফাত। আল্লাহ ত'আলা তাঁর সৃষ্টির মাঝে একমাত্র মানব ও দানবকেই এ গুনে গুনান্বিত হওয়ার যোগ্যতা দান করেছেন। ইলম অর্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তিনটি মাধ্যম বা উপায় সৃষ্টি করেছেন। ১. শ্রবণ শক্তি, ২. দৃষ্টি শক্তি, ৩. বিবেক। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ : (হে মানুষ) তুমি যা জান না তার অনুসরণ কর না। নিশ্চয় শ্রবণ শক্তি,দৃষ্টি শক্তি ও অন্তরসমূহ এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল- ৩৬)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

অর্থ : তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু, ও অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। (সূরা মু'মিনূন- ৭৮)

আরো ইরশাদ হয়েছে,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এ অবস্থায় নির্গত করেছেন যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (সূরা নাহল- ৭৮)

আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইলম হাসিলের উল্লিখিত তিন মাধ্যম এর কৃতজ্ঞতা হবে এটাই যে এগুলোর সঠিক ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলাকে চিনতে ও জানতে চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলার দীন শিখতে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী আমল করার ফিকির করা। যখন এ তিন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে কেউ চেষ্টা করবে তখন সে এর মাধ্যমে ইলমের গুণে গুণান্বিত হতে পারবে। ফলে অর্জন করতে পারবে সার্বিক কল্যাণ ও বর্জন করতে সক্ষম হবে সকল অকল্যাণ।

তিন মাধ্যম ব্যবহার করে ইলম অর্জন বিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে হতে হবে

ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় উল্লেখ করেন যে,

عن محمد بن سيرين قال: ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

অর্থ : হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিশ্চয় এ ইলম; দীন। সুতরাং তোমরা চিন্তা কর কার নিকট থেকে তোমরা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করবে।

এবং এ বিষয়টিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যার কথা শ্রবণের ইচ্ছা করছি কিংবা যার থেকে দীনী জ্ঞান আহরণ করতে চাচ্ছি তার ইলমের কোন সূত্রপরম্পরা আছে কি না? কারণ সনদ বা বর্ণনাসূত্র দীনেরই অংশ। এই সূত্রের ধারা শুরু হয়েছে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন থেকে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীন শিখেছেন সাহাবয়ে কেরাম রাযি.। এভাবে ধারাবাহিকভাবে দীন এবং দীনী ইলম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম মুসলিম রহ. মুসলিম শরীফের ভূমিকায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

الاسناد من الدين، ولولاالإسناد لقال من شاء ماشاء

অর্থ : সূত্রপরম্পরা দীনেরই অংশ। যদি সূত্র না থাকত তাহলে (দীনের ব্যাপারে) যার যা ইচ্ছা তাই বলত।

অন্যান্য ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ের বিকৃতির কারণও এটিই যে, এক পর্যায়ে তারা দীন শিখেছে পণ্ডিতের কাছে গিয়ে। ফলে আল্লাহর নাযিলকৃত ধর্ম এবং ধর্মজ্ঞান বাকি থাকেনি।

দুনিয়াবী কোন জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর অনেক ভদ্রলোককে দেখা যায়, দীনী জ্ঞানে পারদর্শী কারো তত্ত্বাবধান ছাড়াই কুরআন-হাদীস রিসার্চ শুরু করে দেয় এবং সে কোন মৌলবীর দারস্থ হওয়াকে নিজের জন্য অপমানের কাজ মনে করে। ফলে সে ব্যক্তির নিয়ত ভালো থাকা সত্ত্বেও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ইলম তো আল্লাহর দান, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এই সম্মানে ভূষিত করবেন। ইলম শিখতে হলে আলেমের মুখাপেক্ষী হয়েই শিখতে হবে। অন্যের প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হওয়া কিংবা নিজের জ্ঞানের অহংকারে প্রান্তিকতার শিকার হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা যাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা স্বীকার করাই হল ইসলামের শিক্ষা। ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

অর্থ : তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে ভূপৃষ্ঠের প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের একজনকে অপরজনের উপর মর্যাদায় উন্নিত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে পরীক্ষা করার জন্য। (সূরা আন'আম- ১৬৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

অর্থ : তোমরা সে জিনিসের কামনা কর না যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজনকে অপর জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা- ৩২)

সুতরাং বুঝা গেল যে, চোখ, কান আর বিবেক ঠিক থাকলেই যথেষ্ঠ হবে না বরং এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের তত্ত্বাবধানে দীন শিখতে হবে।

আমাদের সমাজে এক শ্রেণী 'আই থিংক' এর রোগে আক্রান্ত। কুরআন-হাদীসের কিছু বাংলা, ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ পড়ে নিজের রায় বা ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে এবং নিজেকে এ কাজের যোগ্য মনে করতে পছন্দ করে। এমন ব্যক্তি থেকে দীন শেখা এবং দীনী বক্তব্য শোনা সর্বসাধারণের জন্য নাজায়েয।

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, কুরআন-হাদীসের কোন বিষয়ে কিছু বলার অধিকার সেই ব্যক্তির রয়েছে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়ের জ্ঞান বিদ্যমান।

১. ইলমুল লুগাহ (আরবী ভাষাজ্ঞান)। কেননা এর দ্বারাই একক শব্দগুলোর অর্থ জানা যায়। হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন,

لايحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخران يتكلم فى كتاب الله اذا لم يكن عارفا بلغات العرب

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাসী কারো জন্য আরবী ভাষা জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে কথা বলা বৈধ নয়।

২. ইলমুন নাহব (আরবী ব্যকরণ শাস্ত্র)। কেননা, ই'রাবের পরিবর্তনে অর্থের মারাত্মক পরিবর্তন ঘটে আর ইলমুননাহব জানার দ্বারা সেই ত্রুটি থেকে বেঁচে থাকা যায়। ড. মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আবু শাহবাহ প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ *তাফসীরে রূহুল মা'আনী*র উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ইলমুন নাহব না জানার ফলে এমন মারাত্মক

ভুলের সম্মুখীন হতে হয়, যা কখনো কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-

أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত।

কিন্তু কেউ যদি وَرَسُولُهُ এর পরিবর্তে رَسُوْلِه তিলাওয়াত করে, তাহলে তিলাওয়াতকারী নিজের অজান্তেই কুফরীতে পতিত হবে। কারণ তখন আয়াতের অর্থ হবে 'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের থেকে ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দায়মুক্ত' নাউযুবিল্লাহ। আর এ আয়াত সম্পর্কে এ ধরনের মারাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইলমুন নাহব তথা আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্র সংকলনের সূত্রপাত হয়।

৩. ইলমুল ইশতিক্বাক (মূলধাতু হতে শব্দগঠন শাস্ত্র)। কেননা একই শব্দ যখন দুটি ধাতু হতে নির্গত হয়, তখন মূলধাতুর ভিন্নতার কারণে নির্গত শব্দের অর্থেও মারাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন 'মাসীহ্' (হযরত ঈসা আ. এর একটি নাম) এ শব্দটি 'সিয়াহাতুন' ও 'মাসহুন' দুই ধাতু হতে উৎসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যদি 'সিয়াহাতুন' ধাতু থেকে উদগত হয় তাহলে 'মাসীহ' অর্থ হবে অধিক ভ্রমনকারী। আর মাসহুন ধাতু থেকে নির্গত হলে অর্থ হবে কাউকে হাতের স্পর্শ দেয়া।

৪. ইলমুস সরফ (শব্দ গঠন ও রূপান্তর শাস্ত্র)। অর্থাৎ এর দ্বারা শব্দের মূল রূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। যেমন আল্লামা যামাখশারী রহ্ঃ তার কৃত তাফসীর গ্রন্থ *তাফসীরে কাশ্শাফে* উল্লেখ করেছন, يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاس بِإمَامِهِمْ 'যেদিন আমি সকল মানুষকে তাদের আমলনামাসহ আহ্বান করব অথবা যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতা সহ আহ্বান করব।' আয়াতের মাঝে উল্লিখিত إمَامٌ শব্দটি সম্পর্কে এক শ্রেণীর লোক ধারণা পোষণ করে যে, এটা أُمٌّ এর বহুবচন। সে হিসাবে উক্ত আয়াতের অর্থ হয় সেদিন আমি সকল মানুষকে, সকল দলকে তাদের মাতা সহ আহ্বান করব, পিতা সহ নয়। এটা এমন অজ্ঞতা যা ইলমুস সরফ না জানার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা أُمٌّ এর বহুবচন امام ব্যবহার হয় না আর আল্লামা যামাখশারী রহ. যথার্থই বলেছেন যে, এটা বিদ'আতী তাফসীর।

৫-৭. ইলমুল মা'আনী, ইলমুল বয়ান, ইলমুল বদী'। এ তিন প্রকার ইলমের সমষ্টি হচ্ছে ইলমুল বালাগাহ। কুরআনে কারীমের অলংকারিত্ব ও অলৌকিকত্ব বুঝার জন্য এর বিকল্প নেই।

৮. ইলমুল কিরাআহ্। এমন শাস্ত্র যার দ্বারা কুরআনী শব্দের উচ্চারণ পদ্ধতি জানা যায় এবং এক ক্বিরাআতকে অন্য ক্বিরাআতের উপর প্রাধান্য দেয়ার সম্ভাব্য কারণ জানা যায়।

৯. ইলমু উসূলিদ দীন (আক্বায়িদ শাস্ত্র)। যার মাধ্যমে আকীদাগত বিষয় ও শরীয়তের হুকুম আহক্বামের মাঝে এবং দীনের মৌলিক বিষয় ও শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ের মাঝে পার্থক্য করতে পারে এবং কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমান পেশ করতে পারে।

১০. ইলমু উসূলিল ফিক্বহ (ফিক্বহের মূলনীতি বিষয়ক শাস্ত্র)। এর দ্বারা কুরআন হাদীস হতে নির্গত আহক্বামের উপর দলীল-প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতি সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়।

১১. ইলমু আসবাবিন নুযুল ওয়া-ইলমু ক্বাসাসি ওয়াল আখবার (কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা-কাহিনী বিষয়ক জ্ঞান)। কেননা কুরআন অবতরণের প্রেক্ষাপট জানার দ্বারা সহজে আয়াতের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আর ইলমুল ক্বাসাস জানার দ্বারা কোনটি ইয়াহুদী কর্তৃক বর্ণিত অনির্ভরযোগ্য ঘটনা, আর কোনটি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঘটনা, উভয় প্রকার বর্ণনার মাঝে পার্থক্য করা যায়।

১২. ইলমুন নাসিখি ওয়াল মানসূখ (রহিত আয়াত ও রহিতকারী আয়াত বিষয়ক জ্ঞান)। এ বিষয়টি অর্জন করা মুফাসসিরের জন্য অত্যন্ত জরুরী। এটা না জানার কারনে মুফাসসিরকে মারাত্মক ভুলে নিপতিত হতে হয়।

১৩. ইলমুল ফিক্বহ (ফিক্বহ শাস্ত্র)। এর দ্বারা ফুক্বাহায়ে কিরামের মাযহাব জানা যায় এবং কুরআনী আয়াত বুঝার ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

১৪. ইলমুল হাদীস (হাদীস শাস্ত্র)। এর দ্বারা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের বিশ্লেষণ ও অস্পষ্ট বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের অস্পষ্টতা দূরীকরণ সহ বিভিন্ন বিষয় জানা যায়।

১৫. ইলমুল মাওহিবাহ (আল্লাহ প্রদত্ত ইলম)। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে তাকেই আল্লাহ তা'আলা এই জ্ঞান দান করেন। (আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন; অধ্যায় ৭৮, আল-ইসরাঈলিয়্যাত ওয়াল-মউযূআত ৪৬৫, মানাযিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন ২২৯)

মৌলিকভাবে উপরোক্ত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত আরো কতিপয় গুণ থাকতে হবে। যেমন ইলমী আমানতদারী, পরিচ্ছন্ন রুচি ইত্যাদি।

মনগড়া তাফসীরের কিছু নমুনা

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হয়ে তাফসীরের পথে পা বাড়ানোর পরিণতি হল গোমরাহী। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল-

১. লা-মাযহাবী বক্তা (আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসূফ সাহেব) দাবী করেন যে, না জানলে জিজ্ঞেস করতে হবে দলীল-প্রমাণসহ। তিনি তার দাবীর স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন সূরা নাহলের আয়াত,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

এ আয়াত সম্পর্কে তার আবিস্কৃত তরজমা হল, 'যদি তোমরা না জান তাহলে জিজ্ঞেস কর। দলীল প্রমাণসহ।' তার এ বিভ্রান্তিকর তরজমা শুনে মনে হয় তিনি আরবী গ্রামার পরিপূর্ণভাবে জানেন না বা এর প্রয়োগ করতে পারেননি। কারণ আয়াতের সঠিক অর্থ হল, আমি আপনার পূর্বে কেবল মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছি-যাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতাম। সুতরাং যদি তোমরা না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। (সে নবীদেরকে প্রেরণ করেছি) মু'জিযা ও কিতাবসমূহ দিয়ে। 'দলীল-প্রমাণসহ জিজ্ঞেস করা' এটি ভূল ও বিভ্রান্তিমূলক অনুবাদ।

২. একই ব্যাক্তি الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ এ আয়াতের তরজমা করলেন যারা ভয়-ভীতি নিয়ে সালাত আদায় করবে। সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার একটি ভয়-ভীতি থাকতে হবে যেটা হবে মানুষের সফলতার কারণ। তার এ তরজমা শুনে মনে হয় তিনি ইলমে ইশতিক্বাক জানেন না কারণ তিনি خَاشِعُونَ এর তরজমা করেছেন ভয়-ভীতি এ শব্দ خ- ش-ع মূলধাতু হতে উদগত যার অর্থ বিনয় ও নম্রতা। আর ভয়-ভীতি অর্থে ব্যাবহৃত শব্দ হল خاشيون যা মূলত خ- ش - ي মূলধাতু থেকে উদগত।

সুতরাং পূর্বোল্লিখিত বিষয়ের জ্ঞান আহরণ না করেই কুরআন কিংবা হাদীসের কোন বিষয়ে মন্তব্য করার আগ্রহ পরিহার করা আবশ্যক।

লেখক : শিক্ষক, মা'হাদু উলূমিল কুরআন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

সিয়াম-কিয়ামের তাৎপর্য ও কিছু জরুরী মাসাইল

মুফতী শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

সিয়ামের তাৎপর্য

মানুষ হচ্ছে পশু ও ফেরেশতার মাঝামাঝি ভারসাম্যপূর্ণ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুটি সৃষ্টির স্বভাব ও ফিতরত এবং চরিত্র ও প্রকৃতির সূক্ষ্ম, নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে মানুষের মধ্যে। মানুষ একদিকে যেমন পাশবিকতার কঠিন নিগড়ে বন্দী; তেমনি অন্যদিকে সে ফেরেশতাকুলের জ্যোতির্ময় গুণাবলীর সুযোগ্য অধিকারী। মানুষ তার সকল স্তরেই যেমন পুণ্য ও পবিত্রতা, স্নেহ ও মমতা সহানুভূতি ও হৃদ্যতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতাসহ যাবতীয় নৈতিক গুণাবলী সমুন্নত রাখতে সদা সচেষ্ট, তেমনি জড় জাগতিক গুণাবলী অর্জনেও সে ব্যস্ত। যাবতীয় পাশবিক দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতাকে সে ঠাঁই দিয়েছে নিজের মধ্যে, যেন সৃষ্টিকুলের ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-অনুভূতির সাথে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। প্রথম প্রকার গুণাবলীর সম্পর্ক আত্মার সঙ্গে। আর দ্বিতীয় প্রকার গুণাবলীর সম্পর্ক দেহের সঙ্গে।

রূহ বা আত্মার সম্পর্ক হচ্ছে ঊর্ধ্ব জগতের সঙ্গে। তাই মানুষকে সদা সে ঊর্ধ্ব জগত অভিমুখেই আকর্ষণ করে। স্মরণ করিয়ে দেয় তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা। সেই সাথে উদ্বুদ্ধ করে জড় জগতের সকল হীনতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এবং এই সোনার খাঁচার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে। তাই সে মানুষকে আহ্বান জানায় পানাহার, ভোগ-বিলাস ও জৈবিক চাহিদার ধরা-বাঁধা নিয়ম-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের অন্তত কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রম করার এবং পানাহারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ক্ষুৎপিপাসার অপার্থিব স্বাদ উপভোগ করার যা হাজারো প্রকার সুমিষ্ট পানীয় ও উপাদেয় খাদ্য গলাধঃকরণের মধ্যে অনুভব করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে মানুষের উপর আত্মার এ প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যখন দেহের মধ্যে চলে আসে তখনই সে পালছেঁড়া নৌকার মতোই ভেসে যায় ভোগ-লালসা, বিলাস-লিপ্সা, অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাশবিক চাহিদার সর্বকুলনাশা স্রোতের টানে। সকল নৈতিক ও মানসিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নেমে যায় সে চরম অধঃপতনের অতল অন্ধকারে। মত্ত হাতির মতোই ছুটে চলে সে তার পাশব ইচ্ছার পিছনে। রশি ছেঁড়া পশুর মত তখন তার একই চিন্তা ও একই ভাবনা-লাগামহীন ভোগ, বাধা-বন্ধনহীন উদরপূর্তি। অরণ্যের পশুও তখন ভাবে, মানুষ বুঝি তাদেরই সমগোত্রীয় কোন জীব! বিবেক-বুদ্ধি, আইন, নৈতিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ, কিংবা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরামর্শ, সতর্কবাণী কোন কিছুই তখন তার উন্মত্ত পাশবিকতার সামনে সামান্য প্রতিরোধও সৃষ্টি করতে পারে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই মানুষের প্রথম শক্তিটি দ্বিতীয়টিকে অবদমিত করে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তখনই গোড়াপত্তন হয়েছে জীবনবিমুখ বৈরাগ্যবাদের। আর যখন আত্মাকে পরাস্ত করে মানুষের পাশবিক শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তখনই অধঃজাগতিক স্বভাব ও প্রবৃত্তির অদম্য প্রাবল্য ঘটেছে এবং জেগে উঠেছে তার ভেতরের ঘুমন্ত হায়েনা।

জীবনবিমুখ বৈরাগ্যবাদ ও ক্ষুধার্ত হায়েনার মাঝে সমন্বয় ঘটাতে প্রজ্ঞাময় আল্লাহ মানব জাতির তরবিয়তের জন্য নাযিল করেছেন সিয়াম সাধনার বিধান। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ তার ভেতরের পাশবিক শক্তি ও ভোগবাদী মানসিকতা কিছু পরিমাণে হলেও দমন করতে সক্ষম হয়। নফস ও প্রবৃত্তির সকল প্রলোভন ও প্ররোচনার সফল মোকাবেলা ও কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। ঝিমিয়ে পড়া আত্মা পুনরুদ্ধার করে তার হৃত উষ্ণতা, সজীবতা ও উদ্যম। ফলে জীবনের সকল স্তরে দেহ ও আত্মার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় সমঝোতা ও ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষ তার সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য হলেও নিজেকে আখলাকে ইলাহীর প্রকাশস্থল রূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। (আরকানে আরবা'আ; পৃষ্ঠা ২০৫-২১৫ সংক্ষেপিত)

কিয়ামের তাৎপর্য

মানুষ একজন স্বভাবপ্রেমিক। প্রেমাস্পদ ও কাঙ্ক্ষিতের সামনে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েই সে আনন্দিত, পরিতৃপ্ত। এতেই সে খুঁজে পায় তার সৃষ্টির স্বার্থকতা। কেননা এটা তার স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সৃষ্টি-উপাদানের অন্তর্ভুক্ত।

অপরদিকে মহান আল্লাহ যেহেতু সকল দাতার বড় দাতা, সকল ক্ষমতাবানদের বড় ক্ষমতাবান, সকল সৌন্দর্যের সমাহার, তাই তিনিই শুধু মেটাতে পারেন মানুষের দেহ ও আত্মার সকল চাহিদা ও প্রয়োজন। এজন্য নিজের প্রয়োজনেই মানুষের উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন মহান প্রতিপালকের ইবাদত-বন্দেগীতে ব্যয় করা; সিজদাবনত অবস্থায় তাঁরই গুণকীর্তনে সদা মশগুল থাকা। তবে এটাও অনস্বীকার্য সত্য যে, এই ইবাদত পদ্ধতি অবশ্যই তার দেহ সত্তার উপযোগী এবং সৃষ্টিগত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে । সেই ইবাদত এমন পোষাকের মত যা দেহ থেকে বড় নয়, ছোটও নয়, সংকুচিত নয়, ঢিলেঢালাও নয়। বলাবাহুল্য কিয়াম অর্থাৎ নামাযই হচ্ছে সেই পোষাক যা স্রষ্টা স্বয়ং মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। (আরকানে আরবা'আ; পৃষ্ঠা ২৬-৩৫ সংক্ষেপিত)

মোটকথা, মানুষ রমাযান মাসে দিনের বেলায় সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তার পাশবিক শক্তি ও ভোগবাদী মানসিকতাকে দমন করে নিজেকে আল্লাহর দিকে কেন্দ্রিভূত করবে। আর রাতের বেলায় প্রকৃত প্রেমাস্পদ হয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে বিলীন করে দিয়ে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়বে। এভাবে একমাস ব্যাপি দিন ও রাতের মেহনত মুজাহাদা একপর্যায়ে তাকে আল্লাহ তা'আলার ওলী বানিয়ে দিবে। এটাই কিয়াম ও সিয়াম সাধনার লক্ষ্য ও তাৎপর্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'হে মুমিন সকল! তোমাদের উপর রমাযানের রোযা ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যেন তোমরা মুত্তাকী (আল্লাহ তা'আলার ওলী) হতে পারো। (সূরা বাকারা- ১৮৩)

জরুরী মাসাইল

১. চাঁদ দেখা : (এক) যদি চাঁদের উদয়স্থল পরিষ্কার না থাকে বরং

উদয়স্থল মেঘ, ধোঁয়া কিংবা ধুলায় ঢাকা থাকে তাহলে রমাযান ছাড়া অন্য সব মাসের জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার সাক্ষ্য চাঁদ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। আর রমাযানের চাঁদ প্রমাণের জন্য দীনদার একজন পুরুষ কিংবা একজন মহিলার স্বচক্ষে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য যথেষ্ট। (মুসতাদরাকে হাকেম ১/৪২৪, সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২৩৩৩, আলবাহরুর রায়েক ২/২৬৩, রদ্দুল মুহতার ২/৩৮৫)

(দুই) উদয়স্থলে যদি চাঁদ দেখার প্রতিবন্ধক কিছু না থাকে এবং উদয়স্থল পরিষ্কার থাকে তাহলে রমাযান ও দুই ঈদের চাঁদ প্রমাণের জন্য যম্মে গাফীর তথা এমন সংখ্যক লোকের চাঁদ দেখা জরুরী যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্তদাতা আশ্বস্ত হতে পারে যে, এতগুলো লোক মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না। আর দুই ঈদ ও রমাযান ছাড়া অন্যান্য মাসের জন্য দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার সাক্ষ্যই চাঁদ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। (আদদুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার ২/৩৯২)

২. নিয়ত : রমাযানের রোযার জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে মনে মনে এই নিয়ত করবে যে, 'আমি আগামীকাল রোযা রাখবো' অথবা দিনে আনুমানিক ১১টার পূর্বে যে কোন সময়ে মনে মনে এইরূপ নিয়ত করবে যে, 'আমি আজ রোযা রাখলাম'। মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট, মুখে নিয়ত করা আবশ্যক নয়। (তবে কেউ যদি মুখেও করে তাহলে আরবী ভালোভাবে বলতে পারলে ও বুঝলে আরবীতে নিয়ত করতে পারে। অন্যথায় বাংলায় নিয়ত করা ভালো।) (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০০৭, রদ্দুল মুহতার ২/৩৭৭)

৩. সাহরী : সাহরী খাওয়া সুন্নাত। পেট ভরে খাওয়া জরুরী নয়। এক ঢোক পানি পান করলেও সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১/৩৫০, মুসনাদে আহমাদ ৩/১২, সহীহ ইবনে হিব্বান; হা.নং ৩৪৭৬)

৪. ইফতার : ইফতার করা সুন্নাত। বিলম্ব না করে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা মুস্তাহাব। (সহীহ বুখারী ১/২৬৩)

খেজুর দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব। না পেলে পানি দ্বারাও ইফতার করা যায়। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৬৯৪)

৫. রোযা ভাঙ্গার কারণসমূহ :

যে কারণে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি আবশ্যক হয়-

রোযা রেখে কোন প্রকার শরয়ী ওযর ছাড়াই ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে বা স্ত্রী সহবাস করলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি জরুরী। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৭০৯, আদদুররুল মুখতার ২/৪০৯)

যেসব কারণে শুধু কাযা ওয়াজিব হয়-

১. নাকে বা কানে ওষুধ বা তেল প্রবেশ করানো।
২. নস্য বা হাপানী রোগের চিকিৎসায় ইনহেলার ব্যবহার করা।
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করা।
৪. বমি মুখের ভিতরে আসার পর তা গিলে ফেলা।
৫. কুলি করার সময় পানি গলার ভিতরে চলে যাওয়া।
৬. দাঁতে আটকে থাকা ছোলার সমান বা তারচে' বড় ধরনের খাদ্যকণা গিলে ফেলা।
৭. মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পড়ে সুবহে সাদিকের পর জাগ্রত হওয়া।
৮. ধুমপান করা।
৯. ইচ্ছাকৃতভাবে আগরবাতী কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ধোঁয়া গলাধঃকরণ করা বা নাকের ভিতরে টেনে নেয়া।
১০. সূর্যাস্তের পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে ভেবে ইফতার করা। (আদদুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার ২/৪০২)
১১. হস্তমৈথুন করা। এটা অত্যন্ত জঘন্য পাপ কাজ। হাদীসে এরূপ ব্যক্তির উপর লা'নত করা হয়েছে। (আদদুররুল মুখতার ২/৩৯৯)
১২. মলদ্বারের ভিতরে ওষুধ বা পানি প্রবেশ করানো। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৪, রদ্দুল মুহতার ২/৪০২)

বি.দ্র. উপরোক্ত কোন কারণে রোযা ভাঙ্গার পর দিনের বাকী সময় রোযাদারের ন্যায় পানাহার ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

যেসব কারণে রোযা ভাঙ্গে না-

১. ভুলে পানাহার করা।
২. আতর সুগন্ধি ব্যবহার করা বা ফুলের ঘ্রাণ নেয়া।
৩. শরীর বা মাথায় তৈল ব্যবহার করা।
৪. বাচ্চাকে দুধ পান করানো।
৫. ঘুমে স্বপ্নদোষ হওয়া।
৬. মিসওয়াক করা।
৭. অনিচ্ছাকৃত বমি হওয়া।
৮. চোখে ওষুধ বা সুরমা ব্যবহার করা।
৯. মশা-মাছি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি অনুরূপ ধোঁয়া, ধুলাবালি অনিচ্ছাকৃত পেটে ঢুকে পড়া।
১০. দাঁত দিয়ে অল্প রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে যাওয়া।
১১. চোখের ১/২ ফোটা অশ্রু মুখে চলে যাওয়া।
১২. যে কোন ধরনের ইনজেকশন বা ইনসুলিন নেয়া।
১৩. এন্ডোসকপি পরীক্ষা করানো। তবে শর্ত হল, নল দ্বারা যেন ভিতরে ওষুধ বা পানি প্রবেশ না করে।
১৪. সাধারণ পদ্ধতিতে এনজিওগ্রাম করানো।
১৫. নাইট্রো গ্লিসারিন ওষুধ ব্যবহার করা।
১৬. কাউকে রক্ত দান করা, যদি রক্তদাতার শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে রক্ত দান করা মাকরূহ। (রদ্দুল মুহতার ২/৪১৯, ৩৯৫, আদদুররুল মুখতার ২/৩৯৪, ৩৯৬, ৩৭১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০২, ২০৩)

৬. মা'যূর বা ওযরের কারণে যাদের রোযা না রাখার অনুমতি আছে :

ক. মুসাফির : মুসাফিরের জন্য সফরে কষ্ট হলে রোযা না রাখা জায়েয আছে; বরং না রাখা উত্তম। আর সফরে কষ্ট না হলে রোযা রাখা মুস্তাহাব। না রাখলে পরে কাযা করে নিবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪২১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৪৪)

সফর অবস্থায় নিয়ত করে রোযা রাখা শুরু করলে অথবা রোযা অবস্থায় সফর শুরু করলে শুধু সফরের কারণে সে দিনের রোযা আর ভাঙ্গা জায়েয হবে না। ভাঙলে গুনাহগার হবে। (ফাতাওয়া শামী ২/৪৩১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২০৬)

খ. ঋতুবতী মহিলা : কোন মহিলার দিনের বেলায় ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে তার জন্য রোযা রাখা জায়েয নেই। বরং সে চুপে চুপে খানা-পিনা করবে এবং পরবর্তীতে রোযাগুলো কাযা করবে। ঋতুবতী কোন মহিলার যদি দিনের বেলায় স্রাব বন্ধ হয়ে যায় তাহলে দিনের বাকী সময় খানা-পিনা থেকে বিরত থাকতে হবে। (আদদুররুল মুখতার ২/৪০৮, ইমদাদুল আহকাম ২/১৩৯)

যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবন করে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখে তাহলে তাকে পুরো মাসই রোযা থাকতে হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করায় কাজটি ঠিক হবে না কারণ এতে শারীরিকভাবে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। (ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৬/৪০৪)

গ. গর্ভবতী : গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখার কারণে তার নিজের বা সন্তানের প্রাণহানী বা মারাত্মক স্বাস্থ্যহানীর প্রবল আশঙ্কা হলে তার জন্য রোযা না রাখা বা

ভাঙ্গা জায়েয। পরে কাযা করে নিবে। (আদদুররুল মুখতার ২/৪২২)

ঘ. স্তন্য দানকারী : রোযার কারণে কোন মহিলার সন্তান দুধ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে এমন আশঙ্কা হলে সে আপাতত রোযা ভাঙতে পারবে এবং পরে কাযা করে নিবে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৭১৫)

ঙ. অসুস্থ ব্যক্তি : রোযার কারণে যে রোগ বৃদ্ধি পায় বা সুস্থ হতে অনেক বিলম্ব হওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় সে রোগের কারণে রোযা ভাঙ্গা জায়েয। উল্লেখ্য, এ আশঙ্কা একেবারেই সুস্পষ্ট হলে তো রোযা ভঙ্গ করতে কোন বাধা নেই। নতুবা এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ দীনদার চিকিৎসকের স্বীকৃতি প্রয়োজন হবে। (আদদুররুল মুখতার ২/৪২২, বাদাইউস সানায়ে' ২/২৪৫)

চ. দুর্বল বৃদ্ধ ব্যক্তি : কেউ বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে একটি করে ফিদয়া দিবে। (সূরা বাকারা- ১৮৪)

ছ. অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে : নাবালেগ ছেলে-মেয়েকে রোযা রাখার হুকুম করতে হবে (অভ্যাস গড়ানোর জন্য), যদি সে এর শক্তি রাখে এবং এর দ্বারা তার কোন ক্ষতি না হয়। (আদদুররুল মুখতার ২/৪০৯)

রমাযানে দিনের বেলায় কোন ছেলে-মেয়ে বালেগ হলে বা কোন কাফের মুসলমান হলে কিংবা মুসাফির সফর শেষ করলে দিনের বাকী সময় খানা-পিনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. কাফফারা : কাফ্ফারা অর্থ একটি রোযার পরিবর্তে ধারাবাহিক দু'মাস রোযা রাখা। যদি ধারাবাহিক দু'মাস রোযা রাখার সামর্থ না থাকে তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে অথবা ৬০ জনকে এক এক ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা আটা কিংবা তার মূল্য দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার ৩/৪৭৬, বাদাইউস সানায়ে' ২/২১২)

৮. ফিদয়া : এক রোযার পরিবর্তে একটি ফিদয়া ফরয। ফিদয়া হলো, সদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ। অর্থাৎ এক কেজি ছয়শত পঞ্চাশ গ্রাম গম বা তার মূল্য অথবা সে মূল্যের সমপরিমাণ কোন দ্রব্য কোন মিসকীনকে দান করা অথবা দু'বেলা পেট ভরে খাওয়ানো। (আদদুররুল মুখতার ২/৪২৭)

৯. তারাবীহ : এর হুকুম হলো, নারী-পুরুষ সকলের জন্য তারাবীহ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়াহ। নারীদের জন্য পুরুষদের জামাআতে শরীক হওয়ার জন্য মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। সুতরাং তারা ঘরে একাকী পড়ে নিবে।

এ নামাযের সময় রমাযান মাসের ইশার পর বিতরের পূর্বে। পুরা রমাযানে তারাবীহ নামাযে একবার কুরআনে কারীম খতম করা সুন্নাত। (কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ১/৪৪৩, কিফায়াতুল মুফতী ৩/৩৬১)

তারাবীহ নামাযের রাকাআত সংখ্যা : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ও উম্মতে মুসলিমার ১৪ শত বছর পর্যন্ত ধারাবাহিক আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিধান হলো, তারাবীহ নামায বিশ রাকাআত। যা আজ অবধি বাইতুল্লাহ শরীফ ও মসজিদে নববীতে চালু আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০১০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৭৬৯১, সুনানে বাইহাকী; হা.নং ৪৬১৫, ৪৬১৭, ৪৬২০, ৪৬২১, ত্ববারানী; হা.নং ৭৭৩৩, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক; হা.নং ৭৭৩২, শরহুল মুহায্যাব ৩/৩৬৩, ৩৬৪)

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।
ইমাম, মসজিদে কুবা, মুহাম্মাদী হাউজিং লি. মুহাম্মাদপুর

(১৬ পৃষ্ঠার পর, ই'তিকাফ ও শবে কদর)

সহজলভ্য রাতটি যদি গাফেল অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটাকে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। তাই প্রতিটি মুমিনের এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগানোই কর্তব্য।

কদরের রাত কোনটি?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আমি রমাযান মাসে কুরআন নাযিল করেছি। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন, আমি কদরের রাতে কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা কদর- ১)

এ দুটি আয়াতকে একত্রিত করলে প্রতীয়মান হয় যে, শবে কদর রমাযান মাসেই হয়ে থাকে। সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. হতে বর্ণিত একটি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রমাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদর তালাশ কর। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০১৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহের কোন একটি রাতই শবে কদর। তবে আল্লাহ তা'আলা তার বিশেষ হিকমতের কারণে এ রাতটি সুনির্দিষ্ট করে দেননি। যেমনটি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য, সহীহ বুখারী; বাবু রফঈ মা'রিফাতি লাইলাতিল কদর)

শবে কদর হাসিল করার উপায়

- রমাযানের শেষ দশকে সুন্নাত ই'তিকাফ করা। অর্থাৎ ২০শে রমাযান সূর্যাস্তের পূর্ব হতে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা। পেশাব-পায়খানা বা ফরয গোসলের প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হওয়া।
- এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শেষ দশকের ইশা ও ফজর নামায গুরুত্বসহ জামাআতের সাথে আদায় করা এবং বেজোড় রাতগুলোতে নামায তিলাওয়াত ইত্যাদি তুলনামূলক বেশি করা। (আমালুস সুন্নাহ; পৃষ্ঠা ১২৯)

শবে কদরে করণীয় কাজসমূহ

- কদরের এ পূণ্যময় রজনীকে অবহেলা না করে গুরুত্ব দিয়ে ইখলাসের সাথে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে থাকা চাই। চাই নফল নামায, তিলাওয়াত বা যিকির আযকার করে হোক, চাই দু'আয় লিপ্ত থাকার মাধ্যমে হোক।
- অতীত জীবনের পাপরাশির কথা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট কাকুতি মিনতি ও রোনাযারীর সাথে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। (সূরা নূহ- ১০)
- ইখলাসের সাথে সওয়াবের আশায় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নেক আমলে লিপ্ত থাকা।
- হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পড়তে থাকা।

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني

(ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৮৫০)

শবে কদরে বর্জনীয় কাজসমূহ

- মসজিদে আলোকসজ্জা করা ও বিনা প্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালানো। কারণ এটা অপব্যয়। আর অপব্যয় করা নাজায়েয। (সূরা আ'রাফ- ৩১)
- জামা'আতের সাথে সালাতুত তাসবীহ বা কিয়ামুল লাইল আদায় করা নাজায়েয। (রদ্দুল মুহতার ১/৫৫২)
- ঘোষণা করে মসজিদে সম্মিলিত দু'আর আয়োজন করা। হ্যাঁ, ঘোষণা বা ডাকাডাকি ছাড়া এমনিতে যারা উপস্থিত আছে তারা দু'আ করে নিলে তা জায়েয।
- এ রাতে মসজিদে প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম করা। কারণ প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম সুস্পষ্ট বিদআত। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ১৭১৪৯)

লেখক : প্রধান মুফতী ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ ইসলামিয়া বাইতুন নূর যাত্রাবড়ি, ঢাকা।
খতীব, ওয়ারলেসগেট চৌরাস্তা জামে মসজিদ, মগবাজার, ঢাকা।

যাকাত ও সাদকায়ে ফিতরের জরুরী মাসাইল

মুফতী মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান

যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমের যেখানেই নামাযের কথা বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সাথে যাকাতের কথাও বলেছেন বিভিন্নভাবে বিচিত্র উপস্থাপনায়।

এজন্য যাকাতের জরুরী মাসআলা মাসাইল জানা অত্যাবশ্যক।

যাকাত কার উপর ফরয

যে ব্যক্তি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা এর মূল্য সমপরিমাণ টাকা বা নোটের মালিক হয় অথবা সমমূল্যের ব্যবসায়ের মালের মালিক হয় এবং তার নিকট এ পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর সময় স্থায়ী থাকে, তার উপর যাকাত ফরয হয়।

যাকাতের শর্তসমূহ

১. যাকাত প্রদানকারী মুসলমান হওয়া।
২. বালেগ হওয়া।
৩. বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া।
৪. স্বাধীন হওয়া।
৫. উক্ত মালের পূর্ণ মালিক হওয়া।
৬. নেসাব পরিমাণ মাল হওয়া।
৭. ঐ মাল তার মৌলিক প্রয়োজনসমূহের অতিরিক্ত হওয়া।
৮. উক্ত মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।
৯. ঐ মাল বর্ধনশীল হওয়া। যেমন, ব্যবসার পণ্য অথবা স্বর্ণ-রৌপ্য কিংবা যাকাতযোগ্য গবাদি পশু ইত্যাদি।

স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

(১) স্বর্ণের যাকাতের নেসাব হল সাড়ে সাত তোলা (ভরি), আর রৌপ্যের নেসাব হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ভরি)।

(২) স্বর্ণ-রৌপ্যের প্রত্যেক বস্তুর উপরই যাকাত ফরয। চাই সেটাকে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার করুক কিংবা এমনিই ফেলে রাখুক। অনেকের ধারণা হল, ব্যবহৃত স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত দিতে হয় না। এটা ভুল ধারণা।

(৩) স্বর্ণ-রৌপ্য যদি খাঁটি না হয়; বরং তার মধ্যে খাদ মিশ্রিত থাকে, সেক্ষেত্রে বেশি অংশের ভিত্তিতে ফয়সালা হবে। অর্থাৎ স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি বেশি হয় তবে সেটা স্বর্ণ বা রৌপ্যই ধর্তব্য হবে এবং যাকাতও ফরয হবে।

(৪) যদি কারো নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনটিই এককভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে; বরং কিছু স্বর্ণ আর কিছু রৌপ্য থাকে, এক্ষেত্রে যদি উভয়টির মূল্য যোগ করার দ্বারা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমান হয়ে যায় তবে যাকাত ফরয হবে। আর যদি উভয়টি এত কম হয় যে, মূল্য যোগ করেও নেসাব পরিমাণ হয় না, তাহলে যাকাত ফরয হবে না।

(৫) যদি কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা যা বা তার চেয়ে অধিক রৌপ্য থাকে, আর বছর শেষ হওয়ার পূর্বে ২/৪ বা ৯/১০ তোলা স্বর্ণও যোগ হয়ে যায় তাহলে ঐ স্বর্ণের বছর পৃথকভাবে গণ্য হবে না; বরং যখন ঐ রৌপ্যের বছর পূর্ণ হবে তখন এটাই ধরে নিতে হবে যে, পরবর্তী সময়ে প্রাপ্ত ঐ স্বর্ণের বছরও পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব ঐ পূর্ণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত আদায় করা ঐ সময়েই ফরয হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, বছরের মাঝে মাল হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা যাকাতের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না। বরং বছর শেষে যে পরিমাণ মাল বিদ্যমান থাকবে পূর্ণ মালের উপরই যাকাত আসবে।

(৬) পরিধানের কাপড় চাই তা পরিমাণে যত বেশি আর যত মূল্যবানই হোক না কেন তার উপর যাকাত ফরয নয়।

নগদ টাকা-পয়সার যাকাত

(১) নগদ টাকা চাই রৌপ্যের হোক কিংবা ধাতব বা কাগুজে নোটের আকৃতিতে হোক, তার উপর যাকাত ফরয।

(২) যদি কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ফরয। কেননা নগদ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের একই হুকুম।

ব্যবসায় পণ্যের যাকাত

ব্যবসায় পণ্য ঐ পণ্যকে বলা হয় যা বিক্রি করার উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। এর নেসাবও তা-ই যা নগদ টাকার নেসাব।

(১) স্বর্ণ-রৌপ্য ও নগদ টাকা ব্যতীত যত জিনিস আছে, যেমন- লোহা, তামা, পিতল, রাং, গিল্টি ইত্যাদি এসবের বিধান এই যে, যদি এসব মাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে সংগৃহিত হয়ে থাকে তবে নেসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে তার যাকাত আদায় করা ফরয। আর যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকে তাহলে যাকাত ফরয হবে না। চাই সেটা যত মূল্যবানই হোক না কেন। আর যত অপ্রয়োজনীয় অবস্থাতেই থাকুক না কেন।

(২) যদি স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোন আসবাবপত্র নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করা হয়, পরে এর দ্বারা ব্যবসায় ও সেটাকে বিক্রি করার ইচ্ছা হয়, কিন্তু এখনো বিক্রি হয়নি। আর এ অবস্থাতেই বছর পার হয়ে যায় তবে তার উপর যাকাত আসবে না।

(৩) দোকানে যে আলমারী, র‍্যাক ইত্যাদি যা পণ্যদ্রব্য রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছে অথবা কোন ফার্নিচার ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য রাখা হয়েছে তাতে যাকাত আসবে না। কেননা এটা ব্যবসার পণ্য নয়।

(৪) যদি কারো একাধিক বাড়ি থাকে এবং সেগুলোকে ভাড়ায় খাটিয়ে থাকে তবে এসব বাড়ির মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে না। চাই সেটা যত মূল্যবানই হোক না কেন। অবশ্য সেগুলোর ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত যে পরিমাণ টাকা বছরের শেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে সেটার যাকাত নগদ টাকা হিসেবে আদায় করা জরুরী হবে।

(৫) প্রিন্টিং প্রেস, কারখানা, মিল ইত্যাদিতে যেসব মেশিন স্থাপন করা হয়ে থাকে সেগুলোও ব্যবসায়িক পণ্য নয়। কাজেই সেগুলোর উপরও যাকাত ফরয নয়।

(৬) মেশিনের উপর যদিও যাকাত ফরয নয় তবে এর দ্বারা যে পণ্য তৈরি হবে তার উপর যাকাত আসবে। অনুরূপভাবে যে কাঁচামাল মিলের বিভিন্ন আসবাব তৈরির জন্য রাখা হয়েছে তার উপর যাকাত ফরয।

যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত

গরীব মিসকীন যাদের ওপর যাকাত কিংবা সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয় তারা যাকাত গ্রহণের হকদার। যাকাত গ্রহিতাদের মধ্যে আত্মীয়তা, প্রতিবেশিত্ব ও দীনদারীর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম। দীনী শিক্ষায় অধ্যয়নরত যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত তালিবে ইলমদের যাকাত দিলে যাকাত আদায়ের পাশাপাশি দীন প্রচারের সাওয়াবেও অংশিদার হওয়া যায়।

যাকাত আদায় করার পদ্ধতি

(১) সম্পদের উপর বছর অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই যাকাত আদায় করে দেয়া উচিত। যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে বিলম্ব করা গুনাহ।

(২) যাকাতযোগ্য সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দেয়া ফরয।

যাকাতের বিবিধ মাসাইল

- মসজিদের ইমাম, মুআযযিন, মাদরাসার শিক্ষক বা কর্মচারীকে বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। তবে তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হলে আলাদাভাবে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে।
- যাকাতের অর্থ কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে।
- মসজিদ, মাদরাসা, খানকা, চিকিৎসালয়, কূপ, পুল বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই।
- অনুরূপভাবে যাকাতের অর্থ দিয়ে কিতাব ক্রয় করে কোন মাদরাসায় ওয়াকফ করাও যাকাত আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয়।
- যাকাতের অর্থ দ্বারা বাড়ি নির্মাণ করে যাকাতের উপযুক্ত দরিদ্র লোকদেরকে অস্থায়ীভাবে বিনা ভাড়ায় থাকতে দেয়ার দ্বারাও যাকাত আদায় হবে না।
- চিকিৎসালয়ের নির্মাণ ও তার প্রয়োজনে এবং কর্মচারীদের বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। অবশ্য যেখানে যাকাত গ্রহণে উপযুক্তদেরকে বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা হয় সেখানে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যায়।
- যাকে যাকাত দেয়া হবে তাকে এ কথা মুখে বলার প্রয়োজন নেই যে, এটা যাকাতের টাকা; বরং তাকে এরূপ না বলাটাই উত্তম।
- যদি কেউ ঋণ চায় আর তার ব্যাপারে এটা জানা থাকে যে, সে এতই দরিদ্র যে, কখনো তা পরিশোধ করতে পারবে না, এমতাবস্থায় তাকে ঋণের নামে যাকাতের টাকা প্রদানের সময় যদি মনে মনে যাকাতের নিয় করে নেয় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।
- যদি কাউকে পুরস্কারের নামে কিছু দেয়া হয়, কিন্তু মনে মনে যাকাতের নিয়ত করে এবং পুরস্কার গ্রহিতা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

সাদকায়ে ফিতরের মাসাইল

অনেকেই অজ্ঞতাবশত মনে করেন যে, যার উপর যাকাত ফরয কেবল তার উপরই সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। এ ধারণা ভুল। কেননা অনেক মানুষ এমন আছে যাদের উপর যাকাত ফরয নয় কিন্তু সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

(১) যে মুসলমান এ পরিমাণ সম্পদের মালিক যে, তার উপর যকাত ফরয কিংবা যাকাত ফরয নয় ঠিক; কিন্তু তার নিকট প্রয়োজন অতিরিক্ত এ পরিমাণ আসবাবপত্র আছে, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান, তাহলে তার উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। চাই সে আসবাবপত্র ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হোক বা না হোক এবং তার উপর বছর অতিক্রান্ত হোক বা না হোক।

(২) কারো নিকট অলঙ্কার, রৌপ্য বা ব্যবসায়িক পণ্য কিছুই নেই, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু আসবাবপত্র আছে যার সামষ্টিক মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান, তবে এ ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয না হলেও সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

(৩) যদি কারো নিকট প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অতিরিক্ত সম্পদ ও আসবাব থাকে, কিন্তু পাশাপাশি সে ব্যক্তি ঋণীও হয়, তবে তাকে ঐ ঋণ বিয়োগ করে দেখতে হবে কতটুকু অতিরিক্ত হয়। যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্য সমপরিমান বা তার চেয়ে বেশি অবশিষ্ট থাকে, তবে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। এর কম হলে ওয়াজিব হবে না।

(৪) যে ব্যক্তি কোন কারণে রোযা রাখতে পারেনি তার উপরও সাদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে রোযাদার বেরোযাদারের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

(৫) ঈদুল ফিতরের নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বেই সাদকায়ে ফিতর আদায় করা উত্তম। যদি পূর্বে আদায় করতে না পারে তবে পরে আদায় করবে।

(৬) যদি কেউ ঈদের দিনের পূর্বে রমাযান মাসেই সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয় তাহলেও আদায় হয়ে যাবে; পুনরায় দেয়া ওয়াজিব নয়।

(৭) যদি কেউ ঈদের দিন সাদকায়ে ফিতর না দেয় তাহলে তা মাফ হবে না। তাকে অন্য কোন সময় তা অবশ্যই আদায় করতে হবে।

(৮) একজনের সাদকায়ে ফিতর একজন ফকীর বা অল্প অল্প করে কয়েকজন ফকীরকে দিতে পারে। উভয় পদ্ধতিতেই দেয়া জায়েয আছে।

(৯) যদি কয়েকজন মানুষের সাদকায়ে ফিতর একজন ফকীরকেই দিয়ে দেয়া হয় তবে তাও জায়েয আছে।

(১০) সাদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র ঐসব লোকদেরকেই দেয়া যায় যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত।

(১১) গম বা আটা দ্বারা সাদকায়ে ফিতর আদায় করা হলে আধা সা' অর্থাৎ এক কেজি ছয়শত পঞ্চাশ (১৬৫০) গ্রাম গম, আটা বা তার মূল্য প্রদান করতে হবে। আর খেজুর, কিশমিশ, পনির বা যব দ্বারা আদায় করলে এক সা' তথা তিন কেজি তিনশত গ্রাম বা তার মূল্য আদায় করবে। সামর্থবানদের জন্য এক সা' খেজুর বা কিশমিশের মূল্য আদায় করা উচিত।

(১২) সাদকায়ে ফিতর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে আদায় করতে হয়। স্ত্রী ও বালেগ সন্তানদের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা জরুরী নয় । তাদের নিজস্ব সম্পদের কারণে তাদের ওপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলে তারা নিজেরাই নিজ নিজ সম্পদ থেকে তা আদায় করবে। তবে পরিবার প্রধান যদি তাদেরকে জানিয়ে তাদের সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকেও আদায় হয়ে যাবে।

লেখক : মুদাররিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
খতীব, লেকসার্কাস জামে মসজিদ, কলাবাগান
ইমাম, মসজিদে বাইতুল ফিরদাউস, মুহাম্মাদপুর

(১৯ পৃষ্ঠার পর, তাবলীগে দীন)

এটা হাসিল করাই হল তাসাওউফ বা তরীকতের উদ্দেশ্য। মাকাম অনেক আছে। তন্মধ্যে দশটি মাকাম তিনি এ খণ্ডে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তওবা, খউফ বা খোদাভীতি, যুহদ বা দুনিয়ার মুহাব্বত ত্যাগ, সবর বা ধৈর্যশীলতা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, ইখলাস বা খালেস নিয়ত, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা, মুহাব্বত, তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি এবং মৃত্যু চিন্তা।

হে আল্লাহ! এ গ্রন্থটিকে আমাদের হিদায়াতের মাধ্যম এবং জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার সহায়ক হিসেবে কবুল ও মঞ্জুর করে নিন। আমীন।

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ;
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

ই’তিকাফ ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়

মুফতী জহীরুল ইসলাম

ই’তিকাফ

মাহে রমাযানে ই’তিকাফ করা একটি গুরত্বপূর্ণ আমল। রমাযানের ফযীলত, বরকত, বিশেষত লাইলাতুল কদরের ফযীলত অর্জনের জন্য ই’তিকাফ অন্যতম একটি মাধ্যম। এটি এমন একটি ইবাদত যার প্রচলন পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা‘আলা হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. কে বিশেষত ই’তিকাফকারীদের জন্য বাইতুল্লাহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন। (সূরা বাকারা- ১২৫)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাদানী যিন্দেগীর প্রায় সব ক’টি রমাযানে ই’তিকাফ করেছেন। শুধু একটি রমাযানে জিহাদের সফরে থাকার কারণে ই’তিকাফ করতে না পারায় পরবর্তী বছর ২০দিন ই’তিকাফ করেছেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৪৪)

এ কারণে ই’তিকাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মাসনূন আমল যা শি‘আরে ইসলামও বটে। রমাযানের শেষ দশকে ই’তিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়াহ। বড় গ্রাম বা বড় শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে অন্তত একজনকে হলেও ই’তিকাফ করতে হবে। কোন মসজিদে ই’তিকাফ না করা হলে পুরো মহল্লাবাসী সুন্নাতে মুআক্কাদা বর্জনের গুনাহগার সাব্যস্ত হবেন। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫০৮)

পুরুষরা যেমন ই’তিকাফ করতে পারেন, তেমনি নারীগণও ই’তিকাফ করতে পারেন। তারা ঘরের নির্জন কোণে ই’তিকাফে বসে রমাযানের বিশেষ রহমত, বরকত ও ফযীলত লাভ করতে পারেন। তাদের জন্য এ ই’তিকাফ মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য, রমাযানের শেষ দশদিন কারো ই’তিকাফ করার সুযোগ না থাকলে তিনি যতদিন বা যতক্ষণ সুযোগ হয় ততক্ষণই ই’তিকাফ করে নফল ই’তিকাফের সওয়াব অর্জন করতে পারেন।

ফযীলত ও উপকারিতা

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعد ما بين الخافقين.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ই’তিকাফ করবে আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক তথা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব অপেক্ষা বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। (শু‘আবুল ঈমান হা. নং ৩৯৬৫)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجزي له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.

অর্থ : প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ই’তিকাফকারী সব রকম গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে এবং তার জন্য সব ধরনের নেক আমলকারীর মতো নেকী লেখা হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৭৮১)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল, ই’তিকাফ করার দ্বারা যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কেননা গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য আল্লাহর ঘর একটি সুরক্ষিত দুর্গ। আর ই’তিকাফ করার কারণে যে সকল নেকীর কাজ করা যায় না (যেমন, জানাযায় শরীক হওয়া, রোগীর সেবা করা ইত্যাদি) তার সওয়াবও পাওয়া যায়। এছাড়াও ই’তিকাফকারী যদি কোন আমল না করে এমনকি ঘুমিয়েও থাকে তবুও সে ইবাদতের সওয়াব পেতে থাকে। কারণ মসজিদে অবস্থান করাই একটি স্বতন্ত্র ইবাদত। উপরন্তু যদি অন্য কোন ইবাদতে মশগুল থাকে তাহলে তো সোনায় সোহাগা।

ই’তিকাফের বিশেষ আরেকটি লাভ হল, এর দ্বারা লাইলাতুল কদর পাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ রমাযানের শেষ দশকই শবে কদর হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনাময় সময়। আর ই’তিকাফকারী এই গোটা সময়ই আল্লাহর ঘরে পড়ে থাকে। তাছাড়া ই’তিকাফকারী দুনিয়ার ঝামেলা থেকে নিজেকে মুক্ত করে পূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সঁপে দিতে পারে। ফলে ফেরেশতাদের সাথে তার সামঞ্জস্য তৈরি হয় এবং দিনরাত ফেরেশতাসুলভ আচরণের উপর অবিচল থাকার একটা চমৎকার প্রশিক্ষণ হয়। অনুরূপভাবে যাবতীয় আদব রক্ষা করে পরিপূর্ণরূপে রোযা রাখার জন্য ই’তিকাফের যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহ তা‘আলার মুহাব্বত ও ভালোবাসা অর্জন ও তাঁর সাথে সশ্রদ্ধ একান্ত সংলাপের জন্য ই’তিকাফের নির্জন মুহূর্তের বিকল্প হতে পারে না।

ই’তিকাফের মাসাইল

- পূর্ণ দশ দিনের ই’তিকাফ করার নিয়ত করা জরুরী। তা না হলে সুন্নাত ই’তিকাফ আদায় হবে না; নফল হয়ে যাবে। আর ২০শে রমাযান সূর্যাস্তের পূর্বেই ই’তিকাফের নিয়তে মসজিদে উপস্থিত হয়ে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত মসজিদে থাকা জরুরী। (আদদুররুল মুখতার ২/৪৪২)
- পুরুষগণ এমন মসজিদে ই’তিকাফ করবে যেখানে নামাযের জামাআত অনুষ্ঠিত হয়; জুমু‘আর জামাআত অনুষ্ঠিত হোক বা না হোক। আর নারীরা তাদের ঘরে নামাযের স্থান সুনির্দিষ্ট করে সে স্থান পর্দা দ্বারা ঘিরে অথবা এমন কক্ষে ই’তিকাফ করবে যেখানে পরপুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং কোন পুরুষ আসলে স্থান পরিবর্তন করতে না হয়। (আদদুররুল মুখতার ২/৪৪০-৪৪২)
- পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ই’তিকাফ করা ও করানো উভয়টিই নাজায়েয। কারণ ই’তিকাফ একটি ইবাদত। আর ইবাদতের বিনিময় দেয়া-নেয়া উভয়ই হারাম। এর দ্বারা ই’তিকাফের দায়িত্বমুক্ত হওয়া যাবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/১৯৯)
- মাসনূন ই’তিকাফ শুরু করলে তা পূর্ণ করা জরুরী। ওযর ব্যতীত ভঙ্গ করা জায়েয নেই। ওযরের কারণে মাঝে দু একদিনের ই’তিকাফ ভঙ্গ হয়ে গেলে শুধু ঐ দিনের ই’তিকাফ রোযাসহ কাযা করে নিতে হবে। (আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১১)

যেসব কারণে ই’তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায় :

- শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত সামান্য সময়ের জন্য মসজিদের বাইরে গেলেও ই’তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। চাই ইচ্ছাকৃতভাবে বের হোক বা ভুলক্রমে বের হোক।

  অনুরূপভাবে চাকুরীজীবিদের নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য বা মামলার হাযিরা দেয়ার জন্য বা ডাক্তার

দেখানোর জন্য বা হজ্জের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট করানোর জন্য বা নিজের অথবা অন্যের জীবন বাঁচানোর তাগিদে অনন্যোপায় হয়ে মসজিদের বাইরে গেলেও ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। তবে এ সমস্ত ওযরের কারণে বাইরে বের হলে গুনাহগার হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/১৪৫, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/৫১৮)

- ফরয ও জুমু'আর সুন্নাত গোসল ব্যতীত স্বাভাবিক গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য স্বাভাবিক গোসল না করলে যদি খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে পেশাব-পায়খানা থেকে ফেরার পথে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে উযূর পরিবর্তে দ্রুত গোসল করে নিলে ই'তিকাফের ক্ষতি হবে না। (ফাতাওয়া শামী ২/১৮১)
- ই'তিকাফকারীর জন্য যে সকল কাজের উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যাওয়া জায়েয সে সকল কাজ শেষ হওয়ার পর যদি বিনা প্রয়োজনে বিলম্ব করা হয় তাহলে ই'তিকাফ ফাসেদ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া শামী ২/১৪৫)

ই'তিকাফ অবস্থায় যেসব কাজ করা মাকরূহ :

- ই'তিকাফ অবস্থায় সওয়াবের কাজ মনে করে চুপ থাকা মাকরূহে তাহরীমী।
- বিনা প্রয়োজনে দুনিয়াবী কাজ যেমন বেচা-কেনা ইত্যাদি করা মাকরূহে তাহরীমী। অবশ্য অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন হলে এবং বিশ্বস্ত কোন লোকের মাধ্যমে সে প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব না হলে পণ্য মসজিদে উপস্থিত না করে বেচা-কেনার চুক্তি করা জায়েয আছে।

ই'তিকাফের মুস্তাহাব ও আদবসমূহ :

- ই'তিকাফের জন্য সম্ভাব্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করা উত্তম। সর্বোত্তম মসজিদ হল, মসজিদুল হারাম, অতঃপর মসজিদে নববী, অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাস, অতঃপর জামে মসজিদ, অতঃপর মহল্লার মসজিদ, অতঃপর যে মসজিদে বড় জামাআত হয়।
- ই'তিকাফরত অবস্থায় তিলাওয়াত, তাসবীহ, দীনী কিতাব পড়া পড়ানো, নামায ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল থাকা উত্তম। নির্দিষ্ট কোন ইবাদত করা জরুরী নয়।

ই'তিকাফ অবস্থায় যেসব কাজ করা যায় :

- খাবার মসজিদে পৌঁছে দেয়ার কেউ না থাকলে তা আনার জন্য, মুআযযিন হলে প্রয়োজনে আযান দেয়ার জন্য, পাঞ্জেগানা মসজিদ হলে জুমু'আর নামাযের জন্য বাইরে বের হওয়া জায়েয।
- জামে মসজিদে জুমু'আ পড়তে গেলে সেখানে জুমু'আর ফরযের পর ছয় রাকাআত সুন্নাত পড়ে বিলম্ব না করে মসজিদে আসা জরুরী। (আননুতাফ ফিল ফাতাওয়া; পৃষ্ঠা ১৩৫)
- ই'তিকাফ অবস্থায় তৈল ও সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং চুল দাড়ি আঁচড়ানো জায়েয আছে।
- পূর্বে বর্ণিত অনুমোদিত প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে বের হয়ে পথিমধ্যে কোন রোগী দেখলে বা উপস্থিত জানাযা নামাযে শরীক হলে শরীয়তে এর অনুমতি আছে। তবে শুধু এ উদ্দেশ্যেই মসজিদ থেকে বের হলে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।
- অপারগতা বা বিনা অপারগতায় মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকে কেউ মাসনূন ই'তিকাফের জন্য প্রস্তুত না হলে অন্য মহল্লা থেকে কেউ এসে ই'তিকাফ করলেও আদায় হয়ে যাবে। কেননা ইতিকাফের দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার জন্য মহল্লাবাসী হওয়া জরুরী নয়।

নারীদের ই'তিকাফ

- স্বামীর অনুমতি নিয়েই নারীদের ই'তিকাফ করতে হবে। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও ই'তিকাফ করলে ই'তিকাফ সহীহ হবে না। (ফাতাওয়া আলমগীরী ১/২১১)
- ই'তিকাফের নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে ঘরের অন্যত্র গেলে নারীদের ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত)
- যে নারীর স্বামী বৃদ্ধ, মাযূর বা অসুস্থ অথবা তার ছোট সন্তানাদি আছে এবং তাদের সেবারও প্রয়োজন রয়েছে কিংবা তার যিম্মায় কোন যুবতী কন্যার দেখভালের দায়িত্ব থাকে সে মহিলার জন্য ই'তিকাফের চেয়ে তাদের খিদমত, সেবা-যত্ন ও দেখভাল করা উত্তম।

শবে কদর

গুরুত্ব ও ফযীলত

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমাযানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত শবে কদর। এ রাতের শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত বুঝানোর জন্য আল্লাহ তা'আলা কদর নামে পবিত্র কুরআনে একটি স্বতন্ত্র সূরা অবতীর্ণ করেছেন। এ রাতের ফযীলত অন্য কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি। শুধু এ উম্মতকেই দেয়া হয়েছে। কারণ এ উম্মত শ্রেষ্ঠ উম্মত; কিন্তু তারা হায়াত পেয়েছে কম। পক্ষান্তরে অন্যান্য উম্মত শত বছর, হাজার বছর পর্যন্ত হায়াত পেতো। ফলে তারা নেক আমল করতে পারতো অনেক বেশি। তাই অল্প হায়াত পেয়েও যেন এ উম্মত অন্যান্য উম্মতের চেয়ে বেশি নেকী অর্জন করতে পারে এবং অন্যান্য উম্মতের চেয়ে নেকীতে পিছিয়ে না থাকে সেজন্য তাদেরকে কিছু সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। লাইলাতুল কদর হল সে সব সুযোগের একটি। এ রাতেই আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআন লওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমান নাযিল হয়েছে।

সেখান থেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুপাতে ক্রমে ক্রমে পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়েছে।

অনুরূপভাবে কদরের ইবাদতকে পবিত্র কুরআনে হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদত করার চেয়েও অধিক ফযীলতের বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (সূরা কদর- ৩)

উল্লেখ্য, এখানে কত বেশি ফযীলত তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। আল্লাহর ভাণ্ডারে অভাব নেই। তিনি কত বেশি দিতে পারেন তা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এছাড়া শবে কদর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত প্রদানের রাত। (সূরা কদর- ৪)

একটি হাদীসে এসেছে, এ রাত্রে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হযরত জিবরাঈল আ. ফেরেশতাদের একটি জামাআত নিয়ে পৃথিবীতে শুভাগমন করেন এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদত গোজার বান্দাদের জন্য সালাম ও রহমতের দু'আ করতে থাকেন।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদর ইবাদতের মাধ্যমে কাটাবে আল্লাহ তা'আলা তার অতীত জীবনের সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯০১)

প্রিয় পাঠক! এক রাতের ইবাদত দ্বারা হাজার বছরের চেয়েও অধিক সওয়াব অর্জন, অতীত জীবনের সমুদয় গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ ও আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমতের প্রত্যাশা মুমিন মাত্রই করে থাকে। সুতরাং মুমিনের সীমাবদ্ধ ও স্বল্পায়ু জীবন থেকে এত মহান ও এত

(১২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)

রমাযানে আকাবিরের তারাবীহ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াত

মাওলানা মুহাম্মদ আবূ সাইম

রমাযানুল মুবারক অত্যাসন্ন। এ মাসটি মুমিনের জন্য পরকালীন ফসল সংগ্রহের এক সুবর্ণ সুযোগ। কোন কাঙ্ক্ষিত বিষয় আমলে আনার জন্য নমুনা সামনে রাখা স্বতঃসিদ্ধ এক কার্যকর পন্থা। নমুনা মানুষকে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজেও সাহস যোগায়। কুরআন-সুন্নাহয় রমাযানের ফযীলত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের রমাযানের আমলসমূহ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার লাগাম আল্লাহর হাতে সপে দিয়েছে, অনুকরণের জন্য কুরআন-সুন্নাহর রমাযান বিষয়ক বর্ণনাগুলোই তার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সময়ের পালাবদলে আমাদের মধ্যে এক অদ্ভূত হীনমন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। রমাযান মাসে নবীজীর উপমাহীন পরকাল সাধনা ও সাহাবায়ে কেরামের সীমাহীন মেহনত-মুজাহাদার বিবরণ শোনে আমরা ভাবি, এগুলো তো বহু শতাব্দী আগের কাহিনী; সে যুগের শক্তিশালী মানুষের জন্যই তা উপযোগী ছিল; আমাদের দ্বারা তো আর এমনতর মেহনত করা সম্ভব নয়! এই অমার্জনীয় হীনমন্যতা দূর করার উদ্দেশ্যেই আমরা নিকট অতীতের (গত এক থেকে সোয়া শতাব্দির) আকাবির উলামায়ে কেরামের রমাযানের কিছু আমল এখানে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। যেন অহেতুক ওযর আপত্তি ঝেড়ে ফেলে আমাদেরও আমলের ময়দানে কদম বাড়ানোর হিম্মত হয়। এখানে আকাবিরদের যেসব আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা তাদের রমাযান কেন্দ্রিক মেহনত মুজাহাদার পূর্ণ চিত্রায়ন নয়; নমুনা মাত্র। আর নমুনা তো ক্ষেত্র বিশেষে মূলের ছায়া হয়ে থাকে।

হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতাবী রহ. (প্রতিষ্ঠাতা, দারুল উলূম দেওবন্দ) প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী ১২৭৭ হিজরীর রমাযান মাসে হেজাযের সফরে তিনি পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয করেন। কিন্তু হযরত ইয়াকুব নানুতাবী রহ. সাওয়ানেহে কাসেমীতে লিখেছেন, তারাবীহ নামাযে কুরআন খতমের পর হযরত কাসেম নানুতাবী রহ. বলেছেন, মাত্র দুটি রমাযানে আমি কুরআনুল কারীম হিফয করেছি। যে দিন হিফয করতাম পৌনে এক পারা বা তার চেয়ে বেশি করে মুখস্ত করতাম। হিফয সম্পন্ন করার পর অত্যধিক পরিমাণে তিলাওয়াত করতাম। মনে পড়ে, একবার এক রাকাআতে সাতাশ পারা তিলাওয়াত করেছিলাম।

সাইয়িদুত তায়েফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী রহ. একবার হাজী সাহেব তার শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলেন, অহঙ্কার বশত নয়; তোমাদের শিক্ষার জন্য বলছি, এ অধম যৌবনে অধিকাংশ রাতেই ঘুমায়নি। বিশেষত রমাযান মাসে মাগরিবের পর দুজন হাফেয সাহেব আমাকে ইশা পর্যন্ত সোয়া সোয়া পারা করে তিলাওয়াত শোনাতো। ইশার পর তারাবীহতে আরও দুজন হাফেযের তিলাওয়াত শোনতাম। তারাবীহর পর একজন হাফেয সাহেব অর্ধ রাত পর্যন্ত এবং অতঃপর তাহাজ্জুদের নামাযে আরও দুজন হাফেয তিলাওয়াত শোনাতো। মোটকথা পুরো রাত এভাবেই কেটে যেতো।

কুতবুল ইরশাদ হযরত গঙ্গুহী রহ. রমাযানুল মুবারকে তার ইবাদত বন্দেগী দেখলে দর্শকের মনও তার জন্য দরদী হয়ে উঠতো। বৃদ্ধ বয়সেও সারাদিনের রোযা রাখার পর মাগরিব বাদ ছয় রাকাআতের স্থলে বিশ রাকাআত আউয়াবীন পড়তেন। এই বিশ রাকাআতে কমপক্ষে দুই পারা কুরআন তিলাওয়াত করা হতো। সেই সঙ্গে এত দীর্ঘ রুকু সিজদা আদায় করতেন যে, দর্শকের মনে হতো তিনি বোধহয় ভুল করছেন। আউয়াবীন শেষে ঘরে ফেরা এবং খানা খাওয়ার জন্য ঘরে অবস্থান করার সীমিত সময়ের মধ্যেই কয়েক পারা তিলাওয়াত করে নিতেন। তারপর ইশা ও তারাবীহতে কমপক্ষে সোয়া ঘণ্টা ব্যয়িত হতো। তারাবীহ শেষে সাড়ে দশটা এগারোটার দিকে ঘুমাতে যেতেন। তারপর একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন। টানা আড়াই/তিন ঘণ্টা তাহাজ্জুদ পড়তেন। ফতোয়া লেখা, মুরীদদের সংশোধনমূলক চিঠির জবাব প্রদানসহ বহু দীনী ব্যস্ততা সত্ত্বেও যোহরের পর খানকাহর দরজা বন্ধ হয়ে যেতো। এ সময় তিনি নির্জনে আসর পর্যন্ত কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। উপরোক্ত আমলগুলো তার বৃদ্ধ বয়সের। এ সময় অসুস্থতার কারণে মাত্র ১৫/১৬ গজ দূরত্বের ইস্তিঞ্জাখানায় যেতেও বিশ্রাম নেয়া লাগতো। কিন্তু ফরয তো ফরয কোন নফল নামাযও কোনদিন তিনি বসে পড়েননি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কষ্ট করে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনিতেই রমাযানুল মুবারকে তার সমস্ত ইবাদত বেড়ে যেতো। কালামুল্লাহ শরীফের তিলাওয়াতের ব্যস্ততা এ পরিমাণে বৃদ্ধি পেতো যে, বাড়িতে আসা-যাওয়ার সময় পথ চলতেও কোন কথা বলতেন না। নামাযে এবং নামাযের বাইরে দৈনিক আধা খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

আ'লা হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. তাযকেরাতুল খলীলে বর্ণিত আছে, হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ. কুরআনুল কারীম শিক্ষাদানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। দেরাদুনের পার্শ্ববর্তী গ্রামে তিনি বিশটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনুরূপভাবে নিজেও কুরআন তিলাওয়াতের আশেক ছিলেন। প্রায় সারাদিনই তিলাওয়াত করতেন। দিন-রাতে সর্বসাকুল্যে এক ঘণ্টার বেশি ঘুমাতেন না। রমাযানে তারাবীহ নামায নিজেই পড়াতেন। রাত দুটো আড়াইটায় তারাবীহ শেষ হতো। রমাযানে দিন-রাতের বেশির ভাগ সময় তিনি তিলাওয়াতেই কাটিয়ে দিতেন। এজন্য খানকায় আগত মেহমানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হতো।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তিনি নিজে হাফেয ছিলেন না, কিন্তু রমাযান মাসে রাতের অধিকাংশ সময় বরং সারা রাত হাফেযদের থেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনে কাটিয়ে দিতেন। এ কাজে কয়েকজন হাফেয সাহেবকে নিয়োগ দেয়া হতো। এসব হাফেয সাহেবান স্থানীয় না হলে তিনি নিজেই তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। তারাবীহ থেকে অবসর হয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উপস্থিতিদেরকে ইলমী বিষয়াদী এবং আকাবিরদের ঘটনাবলী শুনিয়ে উপকৃত করতেন। তারপর সুযোগ হলে

সামান্য আরাম করতেন। অতঃপর শুরু হতো নফল পড়া। একজন হাফেয দু চার পারা শুনিয়ে আরাম করতো, কিন্তু হযরত আগের মতই প্রস্তুত থাকতেন। তারপর আরেকজন হাফেয শোনানো শুরু করতো। এভাবে পালাক্রমে কয়েকজন হাফেয কয়েক পারা করে তিলাওয়াত করতো। তিলাওয়াতকারীদের পরিবর্তন হতে থাকতো কিন্তু হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. কখনও দু তিনটা পর্যন্ত আবার কখনও সাহরী পর্যন্ত তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের তিলাওয়াত শোনতেন। কোন কোন রমাযানে মসজিদে ফরয পড়ে ঘরে চলে আসতেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও খাদেমদেরকে নিয়ে তারাবীহর জামাআত করতেন। এই তারাবীহতে চার চার, ছয় ছয় এবং কখনও কখনও দশ দশ পারা করে তিলাওয়াত করা হতো। তারাবীহ শেষ হলে আরেকজন হাফেয নফল শুরু করে দিতো। এভাবেই চলতো কালামে মাজীদ তিলাওয়াত ও শ্রবণের স্বাদ আস্বাদন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে যখন পা ফুলে যেতো আর আপনজনেরা এ ব্যাপারে মেহনত কম করার পরামর্শ দিতো, তিনি অত্যন্ত আনন্দচিত্তে বলতেন, এবার তাহলে রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযে দাঁড়িয়ে পা ফুলিয়ে ফেলার সুন্নাত আদায়ের তাওফীক হল!

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. মামুলাতে আশরাফিয়া কিতাবে আছে, হযরত থানবী রহ. তারাবীহ নামাযে নিজেই কুরআন মাজীদ শোনাতেন। কোন অপারগতা ছাড়া কখনও কুরআন শোনানো ছাড়েন নি। কুরআনের অর্ধেক পর্যন্ত দৈনিক সোয়া পারা করে, তারপর থেকে এক এক পারা করে তিলাওয়াত করতেন। সাতাশ রমাযানে খতম সম্পূর্ণ হতো। হযরতের তিলাওয়াতের দিলকাশ সৌন্দর্য শুধু শ্রবণের দ্বারাই অনুভবযোগ্য; বলে বোঝানোর নয়। তারাবীহতেও সাধারণ সময়ের মতো তারতীলের সঙ্গে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। কখনও দ্রুত পড়লেও হরফ উচ্চারণের মাত্রা ধীরলয়ে পড়ার মতোই থাকতো। ইযহার ও ইখফার প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। তবে ওয়াকফ ও লাহজার ক্ষেত্রে সাধারণ সময়ের চেয়ে কিছুটা কম রেয়ায়েত করা হতো। কানপুর অবস্থানকালে তারাবীহর জামাতে এত সংখ্যক লোক জমায়েত হতো যে, মাগরিবের পর দ্রুত খাওয়া-দাওয়া সেরে মসজিদে আসলেই কেবল জায়গা পাওয়া যেতো। অন্যথায় বঞ্চিত হতে হতো। তারাবীহ অত্যন্ত ধীর-স্থিরতার সঙ্গে আদায় করতেন। প্রতি চার রাকাআতের পর মাসনূন যিকির করতেন। এ সময় কিছুটা হালকা আওয়াজে পঁচিশ বার দুরূদ শরীফ পড়তেন। কেউ এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন, তারাবীহর প্রতি চার রাকাআতের পর পড়ার জন্য শরীয়তে নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। তবে আমার কাছে দুরূদ পড়াটা উত্তম মনে হয়। আর পঁচিশ বার এজন্য পড়ি যে, কেউ ইচ্ছা করলে যেন এসময় পানি পান করা বা উযুর প্রয়োজন সেরে নিতে পারে। তারাবীহ নামাযে তার রুকু সিজদা অন্যান্য নামাজের মতোই হতো, কোনরূপ তাড়াহুড়া করা হতো না। মসজিদ থেকে তারাবীহ শেষ করে বাড়িতে গিয়ে ঘরের মহিলাদেরকেও চার রাকাআত নামাযে কুরআন মাজীদ শোনাতেন। তারাবীহর খতমের দিন মসজিদে অন্যান্য দিনের মতোই বাতি জ্বলতো, অতিরিক্ত বাতির ব্যবস্থা করা হতো না এবং কোনরূপ মিষ্টি-মিঠাইও বিতরণ করা হতো না। তার ইয়াদ এতোটাই উৎকৃষ্ট ছিল যে, প্যাঁচ লাগাটা ছিল বিরল। কুরআনুল কারীমের সঙ্গে তার অত্যন্ত গভীর একটা সহজাত সম্পর্ক ছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা কুরআন যেন তার চোখে ভাসতো। কোন শব্দ বা আয়াতের ব্যাপারে কোথায় আছে প্রশ্ন করা হলে চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তাৎক্ষণিক বলে দিতে পারতেন। তাহাজ্জুদের নামাযে কিরাআত অধিকাংশ সময় নিচুস্বরে পড়তেন। কখনও উচ্চস্বরেও পড়তেন। অনেক সময় তাহাজ্জুদ নামাযে দু চারজন ভক্তবৃন্দ তার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে যেতেন। হযরত তাদেরকে নিষেধও করতেন না, উদ্বুদ্ধও করতেন না।

শাইখুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. সিলেটে অবস্থানকালে হযরত রহ. নিজেই তারাবীহর ইমামতি করতেন। তার পেছনে তারাবীহ পড়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ আগমন করতো। আযানের পর আর মসজিদে জায়গা পাওয়া যেতো না। এ সকল লোক তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়ে ঘরে ফিরতো। তারাবীহ নামাযে দৈনিক আড়াই পারা তিলাওয়াত করা হতো। প্রথম চার রাকাআতে মৌলবী জলীল সাহেব সোয়া পারা পড়তেন। তারপর হযরত রহ. বাকী ষোল রাকাআতে সেই সোয়া পারাই আবার তিলাওয়াত করতেন। প্রতি চার রাকাআতের পর দীর্ঘ বিরতি দিতেন। তারাবীহতে তিলাওয়াতকালে কোন কোন সময় হযরত রহ. এর মধ্যে জোশ সৃষ্টি হতো। সে সময়ের তিলাওয়াতের মজা না শোনলে অনুভব করা সম্ভব নয়। তারাবীহ শেষে দীর্ঘ সময় ধরে মুনাজাত করতেন। মুসল্লীদের কান্নায় মসজিদে রোল পড়ে যেতো। তারাবীহর পর ওয়াজ নসীহত শুরু হতো।

রাত দেড়টায় মজমা শেষ হওয়ার পর তিনি স্বীয় কামরায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। সেখানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কিছু সময় পরামর্শ হতো। অতঃপর তিনি আধা ঘণ্টা আরাম করতেন। আধা ঘণ্টা পর নিজে নিজেই তার চোখ খুলে যেতো। এবার উযু-ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করতেন। এসময় তিনি অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যেন শব্দ ইত্যাদির কারণে কারও ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। দেখা যেতো তারপরও বহু লোক তার সঙ্গে তাহাজ্জুদে শরীক হওয়ার জন্য সাগ্রহে জেগে থাকতো। তাহাজ্জুদের একাংশে হযরত রহ. নিজেই তিলাওয়াত করতেন আর অপর অংশে মাওলানা জলীল সাহেব। ফজরের পর সামান্য সময় ঘুমিয়েই শয্যা ত্যাগ করতেন। তারপর উযু-ইস্তিঞ্জা সেরে কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যেতেন। সকাল দশটায় সাধারণ সাক্ষাতের জন্য বরাদ্দ সময়ের আগ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতেন। এ ছাড়াও সারা দিনে যখনই কিছুটা সময় পেতেন তিলাওয়াতে লেগে যেতেন। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, হযরতজী ইলয়াস সাহেব রহ. এর ইন্তেকাল পরবর্তী সান্ত্বনা প্রদানের উদ্দেশ্যে হযরত মাদানী রহ. ১৩৬৩ হিজরীর রমাযান মাসে নিযামুদ্দীন আগমন করেন। বহু পীড়াপীড়ির পর সকলের আবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত মাদানী রহ. সেদিন নিযামুদ্দীনে তারাবীহর ইমামতি করেন। এদিন তিনি ২০ রাকাআত নামাযে ১৪তম পারার শেষ অর্ধেক থেকে নিয়ে পনেরতম পারার সূরা বনী ইসরাইলের শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করেন। এমন ধীর-স্থিরতা ও প্রশান্তির সাথে তিলাওয়াত করছিলেন যে, দারুন স্বাদ অনুভব করেছিলাম।

হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ. (তাবলীগ জামাতের প্রথম মুরুব্বী) মাগরিবের নামায আদায় করে ইশার আযান পর্যন্ত নফল নামাযে মশগুল থাকতেন। তারপর মসজিদেই কিছুক্ষণ

আরাম করতেন। প্রায় আধা ঘণ্টা পর উঠে ইশা ও তারাবীহ আদায় করতেন। তারাবীহ নিজেই পড়াতেন। তারাবীহর পর সাথে সাথেই শুয়ে পড়তেন। রাত বারোটায় জাগ্রত হতেন। উযু ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে দুটো সিদ্ধ গরম ডিম খেয়ে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন। সাহরীর শেষ সময়ে সালাম ফিরিয়ে সাহরী গ্রহণ করতেন।

হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ.
(হযরতজী ইলিয়াস রহ. এর আপন ভাই) মাওলানা আশেকে ইলাহী সাহেব রহ. তাযকেরাতুল খলীল নামক কিতাবে লিখেছেন, আমার আবেদনের প্রেক্ষিতে একবার রমাযান মাসে কুরআন শোনানের জন্য মাওলানা ইয়াহইয়া সাহেব মীরাঠ আগমন করেন। আমি লক্ষ্য করলাম সারাদিন চলাফেরার মধ্যেই তিনি এক খতম কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে নেন। ইফতারের সময় তার মুখে সূরা নাস তিলাওয়াতের আওয়াজ শোনা যায়। ট্রেন থেকে নামতেই সেদিন ইশার ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বদা উযু অবস্থায় থাকার অভ্যাস ছিল তার। এ জন্য মসজিদে প্রবেশ করেই জায়নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর টানা তিন ঘণ্টায় দশ দশটি পারা এমন পরিষ্কার ও সাবলীলভাবে তিলাওয়াত করলেন যে, না কোথাও আটকে গেলেন আর না কোথাও প্যাঁচ লাগল। যেন কুরআন শরীফটি তার সামনে খোলা রয়েছে আর তিনি নিশ্চিন্তে তা থেকে পাঠ করছেন। এভাবে তিনদিনে কুরআন খতম করে বিদায় নিলেন; না দাওরের দরকার হল আর না সামে'র প্রয়োজন পড়ল। তিনি বন্ধু-বান্ধবদের আবেদনে তাদের ওখানে গিয়ে দু তিনদিনে কুরআনের খতম শুনিয়ে আসতেন। মসজিদে হলে সাধারণত তিন দিনে খতম হতো আর বাসা-বাড়িতে হলে দুদিনেই খতম শেষ। একবার কোন সফর থেকে ফিরে এক বন্ধুর ওখানে বিশ্রাম করছিলেন। ইমাম সাহেব চৌদ্দতম পারা তিলাওয়াত করছিলেন। তার বার বার ভুল হচ্ছিল আর পেছন থেকে অন্য হাফেয সাহেব লুকমা দিয়ে চলছিলেন। ইমাম সাহেব সালাম ফেরাতেই হযরত ইয়াহইয়া রহ. মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যান এবং ইমাম সাহেবকে জায়নামায থেকে সরিয়ে নিজেই ইমাম বনে যান। তারপর বাকি ষোল পারা ষোল রাকাআতে পড়ে খতম শেষ করে দেন। মুসল্লিদের সেদিন কষ্ট হয়েছিল বটে কিন্তু রমাযানের বারোতম রাতেই কুরআন খতমের আনন্দে সে কষ্ট চাপা পড়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন, যৌবনের রমাযানে নফল নামাযে সারা রাত কুরআন তিলাওয়াত করে কাটিয়েছি। বন্ধুদের আবদারে জীবনের শেষদিকে তাঁর নানী উম্মি বি-র বাড়িতে মহিলাদেরকে এক খতম কুরআন শোনাতে যেতেন। সে সময় সারা রাত ধরে তারাবীহ চলতো। মসজিদ থেকে ফরয পড়ে ঘরে তাশরীফ নিতেন এবং সাহরীর সময় পর্যন্ত ১৪/১৫ পারা পড়া হয়ে যেতো।

হযরত মাওলানা রঊফুল হাসান রহ.
(হযরতজী ইলিয়াস সাহেব রহ. এর মামা) তিনি রমাযানের শেষতারাবীহর প্রথম রাকাআতে আলিফ-লাম-মীম থেকে শুরু করে সূরা ফালাক শেষ করতেন আর দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা নাস পড়ে সাহরীর সময় নামায শেষ করতেন। তারপর তার মাতা উম্মি বি-কে বলতেন, আমি দু রাকাআত পড়িয়ে দিলাম বাকি আঠারো রাকাআত একা একা পড়ে নিন। উম্মি বি রহ.ও সারা রাত ধরে পুত্রের পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দীর্ঘ সময় তারাবীহর পড়তেন ও তিলাওয়াত শোনতেন।

মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের প্রতি অনুরাগ
হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, আমি গর্বস্বরূপ নয় বরং নেয়ামতের প্রকাশ ও শোকরিয়া স্বরূপ বলছি, নিজের অযোগ্যতার কারণে যদিও কিছু করতে পারি না কিন্তু আমার ঘরের মহিলাদের অবস্থা দেখে আনন্দিত হই যে, তাদের অধিকাংশই তিলাওয়াতের ব্যাপারে একে অপরের তুলনায় আগে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ঘরের কাজকর্ম সত্ত্বেও দৈনিক ১৫/২০ পারা সহজেই পড়ে নেয়।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর ওখানে মহিলারাও তারাবীহ নামাযে কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করতো। হযরতের পুত্র তাদেরকে কুরআন শোনাতেন। পর্দার আড়ালে ঘরের মহিলারা এবং বাইরেরও কতিপয় মহিলা জামাতে শরীক হতো। একদিন হযরতের পুত্র অসুস্থ হয়ে পড়ায় অন্য একজন হাফেয সাহেবকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়। হাফেয সাহেব তারাবীহ নামাযে চার পারা তিলাওয়াত করেই প্রস্থান করেন। সাহরীর সময় হযরত ঘরে আসলে মহিলারা অত্যন্ত নারায হয়ে অভিযোগ করেন যে, হযরত! আজ আপনি কোত্থেকে এক হাফেয সাহেব পাঠিয়েছেন, সে তো আমাদের তারাবীহটাই বরবাদ করে দিয়েছে! তিনি বললেন, কেন কি হয়েছে? মহিলারা বলল, জানা নেই তার এত কিসের তাড়া ছিল; মাত্র চার পারা তিলাওয়াত করেই চম্পট দিয়েছে। পরে জানা গেল, হযরতের ঘরের মহিলারা তারাবীহ নামাযে সাত খতম তিলাওয়াত শোনতো। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলা এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের অনুসরণে আমাদেরকেও রমাযানের হক আদায়ে যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

তথ্যসূত্র : শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. প্রণীত *আকাবির কা রমাযান*, *আপ বীতী*, *ফাযায়েলে আমাল*; পীর যুলফিকার আলী নকশবন্দী দা.বা.-এর বয়ান সংকলন *খুতুবাতে যুলফিকার* ইত্যাদি।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, হাজারীবাগ, ঢাকা।
ইমাম ও খতীব : বছিলা বড় মসজিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৩৯ পৃষ্ঠার পর, তাবলীগে দীন)
যায় তার যুক্তিমূলক ও প্রামাণিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে এ খণ্ডে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ দশটি ইবাদতের কথা উল্লেখ করেন এবং তার অন্তর্নিহিত আদব ও তার সুন্নাতসমূহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের ভেদতথ্য তুলে ধরেছেন যেগুলোর প্রতি ইবাদতকারীর সাধারণত অবহেলা হয়ে থাকে। তাই একজন মুমিন যেন এগুলোর উপর অবগত হয়ে আমলসমূহকে বিশুদ্ধ করে তুলতে পারে সে উদ্দেশ্যেই এই আলোচনা। আর উল্লিখিত দশটি ইবাদত হল, নামায, যাকাত, সদকা-খয়রাত, রোযা, হজ, তিলাওয়াতে কুরআন, আল্লাহর যিকর, সদ্ব্যবহার, হালাল রুযী অন্বেষণ, ধর্মোপদেশ দান অর্থাৎ আমর বিল মা'রূফ নাহী আনিল মুনকার এবং সুন্নাতের তাবেদারী।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমলকে খাঁটি আর আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় প্রতিবন্ধক এবং তা দূর করার উপায়ও আলোচনা হয়েছে। তন্মধ্যে আত্মার রোগব্যাধী হল বড় প্রতিবন্ধক। তাই তিনি এ খণ্ডে আত্মার বড় বড় দশটি রোগব্যাধীর কথা উল্লেখ করে তার চিকিৎসা কি হবে তাও সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। উল্লিখিত দশটি রোগ হল, লোভ-লালসা, অধিক কথা বলার আগ্রহ, রাগ বা গোস্সা, হাসাদ বা হিংসা, কৃপণতা বা বখিলী, হুব্বে জাহ বা পদের মোহ, দুনিয়ার মুহাব্বত, তাকাব্বুর বা অহংকার, উজব বা আত্মতুষ্টি এবং রিয়া বা লৌকিকতা।

তৃতীয় খণ্ডে কিভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আত্মার উন্নতি সাধন করা যায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আত্মার উন্নতির একটি স্তর হল মাকামে খুলূক। আর তা অর্জিত হয় এভাবে, প্রথমে মুজাহাদা করে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হয়, পরে করতে করতে একসময় স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। আর অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হওয়াকে খুলূক বলা হয়। **(১৪ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

শিয়া-সুন্নী মতবিরোধ

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানবী রহ.

শিয়া মতবাদ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

ইতিহাসের এ অধ্যায়টুকু পাঠক মাত্রই অবগত থাকবেন যে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারুক রাযি. এর বরকতময় যুগে মুসলিম রাজ্যের সীমারেখায় স্বচ্ছ ও নির্মল নববী আদর্শ ব্যতীত ভিন্ন কোন মতাদর্শের অস্তিত্ব ছিল না। বরং গোটা উম্মতে মুসলিমা মতভিন্নতার প্রভাব থেকে নিরাপদ ছিল। কুফরের মোকাবিলায় তারা ছিল এক দেহ এক প্রাণ। দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা শুরু হয় হযরত উসমান রাযি. এর খিলাফতকালের শেষ দিকে। এ সময়টিতেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ নববী আদর্শের বিপরীতে কিছু ভ্রান্ত ও কুফরী আকীদাকে পুঁজি করে শিয়া মতবাদের উদ্ভব ঘটে।

সূচনালগ্নে এ মতবাদ পুরোপুরি খোলসমুক্ত না হয়ে বাহ্যিকভাবে সুন্দর একটি শ্লোগানের ছদ্মাবরণে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ তাদের শ্লোগান ছিল, হযরত আলী রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন হওয়ার পাশাপাশি নিকটাত্মীয়ও ছিলেন। সুতরাং নবীজীর পর অন্যান্য সাহাবীর তুলনায় তিনিই ছিলেন খিলাফতের অধিকতর যোগ্য উত্তরসূরী। বাহ্যিকভাবে এ শ্লোগান শ্রুতিমধুর হলেও বস্তুত এটা ছিল ইসলামের শিক্ষা ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তেইশ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা ইসলাম বংশীয় মর্যাদা ও খান্দানী আভিজাত্যের ভূতকে সম্পূর্ণ রূপে বিতাড়িত করে তার স্থানে 'তাকওয়া'কে সম্মান ও আভিজাত্য, নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ণয় করেছে । আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 'তাকওয়া'র গুণে সর্বাধিক গুণান্বিত ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবু বকর রাযি.। যাকে কুরআন মাজীদে 'সর্বাধিক তাকওয়ার অধিকারী' সম্বোধন করা হয়েছে (সূরা লাইল- ৫)। এ কারণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে তিনিই ছিলেন খিলাফতের বেশি হকদার।

কূফার জামে মসজিদের মিম্বরে হযরত আলী রাযি. কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে খিলাফতের জন্য হযরত আবু বকর রাযি. কে কেন মনোনীত করা হল? জবাবে তিনি বলেছিলেন, দীনের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় নামাযের ইমাম হিসেবে হযরত আবু বকর রাযি.-কেই মনোনীত করেছিলেন, অথচ আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপস্থিতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তা সত্ত্বেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বাদ দিয়ে হযরত আবু বকর রাযি. কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে আমাদের দীনের জন্য নির্বাচন করেছিলেন আমরা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পরিচালনার জন্য তাকেই মনোনীত করেছি।

মোটকথা, 'হযরত আবু বকর রাযি. এর তুলনায় হযরত আলী রাযি. কে খিলাফতের অধিক হকদার মনে করা' এ ভ্রান্ত ধারণার উপরই ছিল শিয়া মতবাদের ভিত্তি।

শিয়া মতবাদের ক্রম বিকাশ

এ ভ্রান্ত আকীদা ও মতবাদের গোড়াপত্তন হয় ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও তার সঙ্গী মুনাফিকদের হাতে। যারা ইসলামের বিজয়াভিযানের অগ্রগতি দেখে প্রতিনিয়ত অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছিল। ইসলামের ক্রমবর্ধমান বিজয় স্রোতের অপ্রতিরোধ্য গতিধারাকে বাধাগ্রস্ত করার একটিই পন্থা তাদের ছিল। তা হল, ভ্রান্ত মতবাদের বিষাক্ত বীজ বপন করে উম্মতে ইসলামিয়ার ঐক্যের মাঝে ভাঙন সৃষ্টি করা। কেননা মুসলমানদের ঐক্যের প্রাচীর যতদিন সুদৃঢ় থাকবে, ততদিন কুফরের নর্দমার ছিটা মুসলিম পল্লীতে পৌঁছবে না।

এ বোধ ও অনুভূতি থেকেই উক্ত মুনাফেক দল 'হুব্বে আলী'র আবরণে ভ্রান্ত আকীদার বিষাক্ত পদার্থ ভরে দিয়ে সুন্নাহ বিবর্জিত মতবাদ দ্বারা ইসলামের মারকাযকে ধ্বংস করার মনঃস্থ করল। যদি ইসলাম আল্লাহর সর্বশেষ দীন না হত এবং আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার হিফাযতের ওয়াদা না করতেন, তাহলে মুনাফিকদের চক্রান্তের আঘাতে ইসলামের সুদৃঢ় কেল্লা ধ্বসে পড়া অসম্ভব ছিল না। যেভাবে সেন্ট পল হযরত ঈসা আ. এর ধর্মকে বিকৃত করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। তেমনি ইয়াহুদী চক্রান্ত ইসলামের সঠিক রূপরেখা পাল্টে দিতেও সাফল্য লাভ করতো।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এ দীনের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং স্বয়ং হযরত আলী রাযি. অত্যন্ত কঠোরভাবে এ ফিৎনার গতিরোধ করেছিলেন। ফলে শিয়া আকীদা ও মতবাদ 'তাকিয়া'[১] এর ছদ্মাবরণে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল।

শিয়াদের দল-উপদল

পরবর্তীতে শিয়ারা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যার বিস্তারিত আলোচনা বড় পীর শাহ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. এর *গুনইয়াতুত তালিবীন* এবং হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. এর *তুহফায়ে ইসনা আশারিয়া* কিতাবদ্বয়ে দেখা যেতে পারে।

শিয়ায়ে ইমামিয়া

শিয়াদের একটি অন্যতম দল হল, 'শিয়ায়ে ইমামিয়া' বা 'শিয়ায়ে ইসনা আশারিয়া'। বর্তমানে শিয়া বলতে সাধারণভাবে এদেরকেই বুঝায়। শিয়ায়ে ইমামিয়ার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের বিস্তারিত আলোচনা তো এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে তাদের কিছু মৌলিক চিন্তাধারা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ইমামত : শিয়া মতবাদের প্রধানতম আকীদা হল ইমামতের আকীদা। এ আকীদার ব্যাখ্যাা হল, যেভাবে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে

---

[১] 'তাকিয়া' এটি শিয়াদের একটি ভ্রান্ত আকীদা। এর অর্থ হলো, অন্তরে এক কথা লালন করা, আর মুখে আরেক কথা বলা ও প্রতারণা করা। অথচ এটা মিথ্যারই নামান্তর। শিয়াদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যগ্রন্থ উসূলে কাফীতে বলা হয়েছে, যে তাকিয়া করবে না সে মুমিন নয়।
-সম্পাদক

প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর মানবজাতির পথনির্দেশের জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইমামদেরকে মনোনীত করা হয়েছে। শিয়া আকীদা মতে এই ইমামগণ হযরত আম্বিয়া আ. এর মতই নিষ্পাপ। তাদের উপর ওহীও অবতীর্ণ হয়। নবীদের মতই তাদের কথা মানা উম্মতের জন্য ফরয। তারা নবীদের মতই শরীয়তের বিধি-বিধান প্রণয়ন করেন। এমনকি তারা কুরআনে কারীমের যে কোন হুকুমকে নিজেদের ইচ্ছামত রহিত করার অধিকার রাখেন...!!

মোটকথা, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে একজন শরীয়ত প্রণেতা নবীর যে অবস্থান শিয়া আকীদামতে তাদের নিষ্পাপ ইমামদেরও(!) সেই অবস্থান।

ইসলামের দৃষ্টিতে ইমামতের আকীদা

শিয়াদের এই ইমামতের আকীদা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী হওয়ার অকাট্য বিশ্বাসের বিপরীতে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ এবং ইসলামের সার্বজনীনতার বিরুদ্ধে একটি প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র। এ কারণেই শিয়া মতবাদের উদ্ভবের সময় থেকে নিয়ে বর্তমানের মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী পর্যন্ত যারাই নবুওয়াত ও রিসালাত প্রাপ্তির দাবী করেছে তারা শিয়াদের এই ইমামতি আকীদা থেকেই নিজেদের মিথ্যা দাবীর সমর্থনে রসদ সংগ্রহ করেছে।

শিয়াদের আকীদায়ে ইমামত ছিল সৃষ্টি জগতের স্বাভাবিক নিয়ম বিরুদ্ধ। এ কারণে খোদ শিয়া মতবাদও এ আকীদার বোঝা বেশি দিন বইতে পারেনি। বরং ইমাম আগমনের ধারাকে দ্বাদশতম স্তরে সমাপ্ত করে ২৬০হি. সনে কোন অজ্ঞাত গুহাভ্যন্তরে (শিয়াদের ধারণামতে উক্ত গুহার নাম 'সুররা মান রাআ') চিরকালের জন্য দ্বাদশতম ইমামকে বিস্মৃত করে দিয়েছে। তারপর এগারটি শতাব্দি অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু আজও তারা জানে না, বারতম ইমাম কোথায় কোন অবস্থায় লুকিয়ে আছে।

শিয়াদের এই ইমামত আকীদা নিয়ে আমি যতই ভাবি ততই আমার মাঝে এ বিশ্বাস দৃঢ়তা লাভ করে যে, মূলত এ ভ্রান্ত আকীদা ইয়াহুদীদের সৃষ্ট। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ নবী হওয়ার মৌলিক বিশ্বাসের মূলে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে এবং উম্মতের মাঝে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার জন্ম দেয়ার হীন অভিপ্রায়ে নবুওয়াত ও ইমামতের দাবীর এ চোরাপথ তারা আবিষ্কার করেছে।

পাঠক! চিন্তা করুন, হযরত ঈসা আ. এর প্রত্যাগমন ও হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাঝে সুদীর্ঘ ছয়শত বছর সময়কাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা কোন হাদী (সরল পথ নির্দেশক) প্রেরণ করলেন না। আর খতমে নবুওয়াতের প্রদীপ্ত রবি কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে যখন অস্তমিত হল তখন (শিয়া আকীদামতে) আল্লাহ তা'আলা একদিন কিংবা একটি মুহূর্তও দেরী না করে সাথে সাথেই একজন মা'সুম ইমাম পাঠালেন এবং তাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত হালাল হারামকে পরিবর্তন করার এবং পবিত্র কুরআনের কোন কোন হুকুমকে রহিত করার ক্ষমতা পর্যন্ত দিয়ে দিলেন! শুধু তাই নয়; একই ক্ষমতা দিয়ে একে একে বারো জন ইমাম পাঠালেন। এরপর ইসলামের আড়াইশ' বছরের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হতে না হতেই আল্লাহ তা'আলা নিজেই সে ইমামতের ধারাকে আবার বন্ধ করে দিলেন। এমনকি বারতম ইমাম হিসেবে যাকে পাঠিয়েছিলেন তাকেও মাত্র দু' বছর বয়সেই অজানা কোন গুহার অন্ধকারে চিরকালের জন্য বিস্মৃত করে দিলেন...!!

একজন সাধারণ মুসলমান যে কি না নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালত ও নবুওয়াতের উপর ঈমান রাখে এবং নিজের মাঝে এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, সার্বজনীন এ ইসলামের অস্তিত্ব পরিবর্তন, বিকৃতিসাধন কিংবা বিলীন হওয়ার জন্য নয়; বরং কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকার জন্য এবং পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য এসেছে, এক মুহূর্তের জন্যও সে কি শিয়াদের এ ভ্রান্ত আকীদা *ইমামত*-এর প্রতি বিশ্বাস করতে পারে?

শিয়া সম্প্রদায় যাদেরকে নিষ্পাপ ইমাম বলে দাবী করে তারা নিজেরা না কখনো ইমামতের দাবী করেছেন, আর না সৃষ্টি জগতের কাউকে নিজেদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। বরং এ সকল ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশিষ্ট মনীষী এবং মুসলমানদের চোখের জ্যোতি ছিলেন। তাদের দীন-ধর্ম, তাদের মত ও পথ এবং তাদের ইবাদত-বন্দেগী কখনোই শিয়া আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। বরং তারা সকলেই সাহাবা রাযি. ও তাবেঈন রহ. এর তরীকার উপর ছিলেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দীন রেখে গিয়েছিলেন এবং গোটা মুসলিম বিশ্ব যে দীনকে আঁকড়ে ধরেছিল, এ সকল আকাবিরও সে দীনেরই পাবন্দ ছিলেন। তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি মানুষের অগোচরে ছিল না। কিন্তু শিয়াদের আকীদা হল, তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের পরিপন্থী আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন। তবে 'তাকিয়া' স্বরূপ বাহ্যিকভাবে তারা মুসলমানদের মত আমল করতেন। শিয়াদের বিশ্বাসমতে আল্লাহ তা'আলা যাকে ইমামে মা'সুম বানিয়ে পাঠালেন, সে দুনিয়ার কাউকে হিদায়াত করতে পারল না; বরং নিজেই কি না সারা জীবন 'তাকিয়া'র লেবাস পরে থাকলেন। আর বারতম ইমাম সাহেব তো এমন গায়েবই হলেন যে, আজ পর্যন্ত তার টিকিটিও কেউ খুঁজে পেল না। বড় অদ্ভুত এ মতবাদ, বড় অদ্ভুত তাদের ইমাম সাহেব!

সুতরাং বুঝা গেল, শিয়াদের এই ইমামতের আকীদা কেবল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত ও রিসালাতের সঙ্গে সাংঘর্ষিকই নয়; সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিরও পরিপন্থী এবং এ মতবাদ মহান আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা নয়; বরং কোন ইয়াহুদী মস্তিষ্কে সৃষ্ট মতবাদ।

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা

শিয়াদের একটি (কুফরী) আকীদা হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আবু বকর রাযি. এর হাতে খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করার কারণে সকল সাহাবী (যাদের মধ্যে স্বয়ং আলী রাযি.ও ছিলেন) –নাউযুবিল্লাহ– কাফের হয়ে গেছেন। কেননা তারা মা'সুম ইমাম হযরত আলী রাযি. এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেননি। আর যেহেতু তিন খলীফার যামানায় হযরত আলী রাযি. মুসলমানদেরকে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহবান করেননি। এ কারণে তাঁর প্রতিও তারা অসন্তুষ্ট!

শিয়াদের এ আকীদা এতটাই বিভ্রান্তিমূলক যে, এর ভ্রষ্টতা প্রমাণের জন্য বিস্তর আলোচনার প্রয়োজন নেই।

এই ভ্রান্ত আকীদার দাবী হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুনিয়ায় আগমন সম্পূর্ণ অনর্থক, বেকার এবং নিষ্ফল ছিল। অথচ ইসলামের দাবী হল, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য পথনির্দেশক। এর বিপরীতে শিয়া মতবাদের দাবী হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর ইসলাম একদিনও বেঁচে থাকেনি। বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার তেইশ বছরের যিন্দেগীতে ধারাবাহিক মেহনত করে সাহাবায়ে কেরামের যে পবিত্র জামাআত তৈরি করেছিলেন, যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অনাগত উম্মতের মাঝে দীন প্রাপ্তির একমাত্র সেতুবন্ধ ছিল, নবীজীর ইন্তেকালের পর তাঁরা সকলেই (নাউযুবিল্লাহ) কাফের হয়ে গিয়েছিলেন! তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদা দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে শিয়া মতবাদের অবস্থান।

শিয়া মতবাদ হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীবৃন্দ এবং স্থলাভিষিক্ত সাহাবীদেরকে বিদ্বেষ ও শত্রুতার লক্ষবস্তুতে পরিণত করে খোদ ইসলাম এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। মানবেতিহাসে নিজেদের দীনী মুরুব্বীদেরকে এমন নগ্ন হামলার লক্ষস্থলে পরিণত করার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর নেই।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উস্তাদ ইমাম শা'বী রহ. বলেন, যদি ইয়াহুদীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তাদের মধ্যে সর্বোত্তম কারা? তবে তারা নির্দ্বিধায় বলবে, হযরত মূসা আ. এর সাথীবৃন্দ। যদি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম কারা? তারা নিঃসঙ্কোচে বলবে, হযরত ঈসা আ. এর সঙ্গীরা। কিন্তু যদি শিয়াদের জিজ্ঞাসা করা হয়, উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট কারা? তবে তারা জবাবে বলবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা (নাউযুবিল্লাহ)। (তাফসীরে মাযহারী)

যাই হোক, শিয়াদের ইমামতের আকীদা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খতমে নবুওয়াতের বিপরীতে বিদ্রোহ হয়। তবে তাদের সাহাবা বিদ্বেষের আকীদা হবে খতমে নবুওয়াতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণ।

কোন ঈমানদার মুসলমানের জন্য এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে, হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর এক মুহূর্তেই সকল সাহাবা একসাথে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। (নাউযুবিল্লাহ)।

শিয়াদের তৃতীয় আকীদা

এটা পূর্বের দুই আকীদার চেয়ে বেশি মারাত্মক। তবে দুয়ে দুয়ে চারের মতই এ আকীদা পূর্বের দু আকীদার সরল যোগফল। আর তা হল, তাহরীফে কুরআন (কুরআনের বিকৃত হওয়া) এর আকীদা। মুসলমান তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর কোন কাফেরও এ দুঃসাহস দেখাতে পারেনি, আর না কোন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন কেউ এ ধৃষ্টতা দেখাতে পারে যে, যুগের পর যুগ শত সহস্র লাখ হাফেযের সীনায় কুরআন মাজীদ নামে যে পবিত্র কিতাব সংরক্ষিত হয়ে চলে আসছে তা হুবহু ঐ কিতাব নয়, যা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধুবাদ (!) জানাতে হয় শিয়া মতবাদের জন্মদাতাদের যোগ্যতাকে যে, তারা তাদের অনুসারীদেরকে এরকম জঘন্য বিশ্বাসও গেলাতে সক্ষম হয়েছে।

শিয়া মতবাদের বক্তব্য হল, মুসলমানদের কাছে কুরআনে কারীমের সংরক্ষিত রূপটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ আসল কুরআন নয়। বরং এটা হযরত উসমান রাযি. এর সহীফা। আসল এবং বড় কুরআন তাদের কথিত বারতম ইমামের সাথে কোন অজ্ঞাত গুহায় দাফন হয়ে আছে! হাতে গোনা দু' চারজন ব্যতীত শিয়াদের ইমাম, মুজতাহিদ, উলামাশ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই এ আকীদা পোষণ করে। এবং তাদের রচিত কিতাবসমূহে তাদের মা'সুম ইমামদের থেকে এ আকীদার সত্যায়নে (?) দুই সহস্রাধিক বর্ণনা রয়েছে।

শিয়াদের এ কুরআন বিকৃত হওয়ার আকীদার মূল উৎস হল, তাদের ধারণা মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সকল সাহাবী (নাউযুবিল্লাহ) মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম যখন তাদের নিকট ধর্মচ্যুতির দোষে দুষ্ট, তখন সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে বর্ণিত কুরআনের সত্যতার উপর ঈমান রাখা তাদের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এ কারণেই যে দু' চারজন শিয়া আলেম কুরআনের সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েছে, সর্বপ্রথম তারা সাহাবায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদার উপর ঈমান আনতে বাধ্য হয়েছে। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, শিয়া মতবাদ মেনে নিয়ে কারো পক্ষে কুরআনের সত্যতায় বিশ্বাসী হওয়াই সম্ভবপর নয়।

শিয়া সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তিমূলক আরো অনেক আকীদা রয়েছে। আমরা তার বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না। আশা করি উল্লিখিত তিনটি আকীদার অসারতার মাঝেই জ্ঞানী পাঠক এ চিন্তার যথেষ্ট খোরাক পাবেন যে, ইসলামের সাথে শিয়া সম্প্রদায়ের ন্যূনতম সম্পর্কেরও কোন সুযোগ আছে কি না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ দেয়ার উদ্দেশ্যে একবার একটি সমান্তরাল রেখা টেনে বললেন, এটা হল আল্লাহর পথ। এরপর উক্ত রেখার আশেপাশে আরো কিছু রেখা টেনে বললেন, এগুলো হল ঐ সকল পথ, যার প্রত্যেকটির প্রবেশমুখে এক একজন শয়তান দাঁড়িয়ে পথিকদেরকে তাদের প্রতি আহ্বান করছে।

এ হাদীসের আলোকে বলব, শিয়া মতবাদ হল আল্লাহর সরল সঠিক পথের বিপরীতে সর্বপ্রথম বক্রপথ। আল্লাহর বান্দাদেরকে বিপথগামী করার জন্য যে পথ শয়তান তার ইয়াহুদী এজেন্টদের মস্তিষ্কের কারখানায় তৈরি করেছে। শিয়াদের মিশন ছিল, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের প্রথম দিন থেকে উম্মতের সাথে তাঁর সম্পর্কের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করে দেয়া। তারা ইসলামের সবুজ শ্যামল বৃক্ষের মূলোৎপাটনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করেছিল এবং ইসলামের বিপরীতে একটি নতুন ধর্মের গোড়াপত্তন করেছিল।

পাঠক জেনে থাকবেন যে, শিয়া সম্প্রদায় ইসলামের কালেমার উপরও সন্তুষ্ট নয়। বরং তারা তাদের কালেমাতে علی ولی الله وصی رسول الله وخليفة بلا فصل (হযরত আলী রাযি. আল্লাহর ওলী, নবীজীর ওসী এবং মাঝে কারো বিভাজন ছাড়াই তিনি সরাসরি নবীজীর খলীফা)-এর জোড়াতালি যুক্ত করে থাকে। এবার আপনারাই বলুন, যখন ইসলামের কালিমা আর কুরআনই শিয়াদের সমর্থন পেল না, তখন ইসলামী কেল্লার আর কোন অংশটি তাদের নগ্ন আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে? তাদের সকল আকীদা-বিশ্বাসে অশুভ ছায়ার রেখাপাত কেবল এজন্যই যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যার ভয়াবহতা থেকে সকল মুমিনের আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত । সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 'ওহী ইলাহী'র সর্বপ্রথম সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ। তাদের জীবনচরিত ছিল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের একটি

অংশ। তাদের চারিত্রিক উৎকর্ষ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের সুস্পষ্ট দলীল এবং তাঁরা অনাগত মানব জাতির সকলের জন্য অনুসৃত, শিক্ষক এবং পথ নির্দেশক। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনের আমানতকে তাদের কাছে অর্পণ করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে আগত উম্মতের যারাই দীনের যা কিছু পেয়েছে তা এ সকল মনীষীদেরই বরকতে এবং বদৌলতেই পেয়েছে। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মুহাব্বত রাখা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর রাসূলের প্রতি মুহাব্বত রাখা। কেননা এ ভালোবাসার উৎস তো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একইভাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মূলত নবীজীর প্রতি বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

এ কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ। আর তাদের সাথে বেয়াদবী করা শুধু অকৃতজ্ঞতাই নয়; বরং বেঈমান হওয়ার অন্যতম কারণ। এজন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সকলেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারবর্গ এবং সাহাবায়ে কেরামের পায়ের ধূলাকে সৌভাগ্যের বারিধারা এবং বরকতের ঝর্ণাধারা মনে করে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যার সামান্য সম্পর্কও রয়েছে সে তো নবীজীর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বস্তুকেই ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখবে। আর সে ভালোবাসার চোখে সাহাবায়ে কেরাম তো হবেন সর্বাধিক প্রিয়পাত্র। কারণ তারাই তো নবীজীর স্থলাভিষিক্ত এবং তাদের কুরবানীর বদৌলতেই তো আমরা দীন পেয়েছি।

এ কারণে যারা হযরত আলী রাযি. এর প্রতি ভালোবাসার ধুয়ো তুলে হযরত উসমানের বিষোদগার করে তারা যেমন আমার দৃষ্টিতে ভ্রষ্ট তেমনি ঐ সকল লোকদের মতকেও আমরা গুমরাহ মনে করি, যারা হযরত আলী রাযি. এর শানে সামান্যতমও বেয়াদবী করে।

আমরা নবীজীর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি ভালোবাসা রাখা ঈমানের অপরিহার্য অংশ মনে করি। তাদের মধ্য থেকে কারো সম্মানে আঘাত করা চাই তা অস্পষ্ট ইঙ্গিতাকারেই হোক না কেন, ঈমান ধ্বংসের আলামত মনে করি।

এটাই আমাদের আকীদা, আর এ আকীদা নিয়েই আমরা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে চাই। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার প্রতিটি মানুষকে এমন আকীদা পোষণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

অনুবাদক : মাওলানা ছফিউল্লাহ
শিক্ষার্থী, ফাতাওয়া বিভাগ (১ম বর্ষ), জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

(২৮ নং পৃষ্ঠার পর, জিন জাতি)

তাফসীরে কুরতুবী [সূরা আহকাফ- ১৩০], তাফসীরে ইবন কাসীর [সূরা রহমান- ২২], আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ৪৬)

হযরত হাসান বসরী রহ. (১১০হি.) বলেন,

بعث الله محمدا صلي الله عليه وسلم الى الانس والجن و لم يبعث الله تعالى قط رسولا من الجن ومن أهل البادية ولا من النساء وذلك قوله تعالى: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من أهل القرى. (سورة يوسف– ١٠٩)

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ ও জিন জাতির প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা কোন জিন, গ্রাম্য বেদুঈন এবং নারীকে কখনো নবী বানাননি। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন, 'আর আমি আপনার পূর্বে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের মধ্য হতে তারা সকলে মানুষই ছিলেন। (সূরা ইউসুফ- ১০৯)

জিনেরা জান্নাত জাহান্নামে যাবে কি না?

এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম একমত যে, জিনদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আপন কওমের নিকট দাওয়াত প্রদানকালে দাঈ জিনদের কথা এভাবে বিবৃত করেছেন,

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.

এ আয়াত দ্বারা কাফের জিনদের জাহান্নামে প্রবেশের বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা জিন- ১৫])

তবে জিনদের মধ্যে যারা মুমিন, সৎকর্মশীল তারা জান্নাতে যাবে কি না? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

(১) কারো মতে তারা মূল জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে জান্নাতের এতটুকু কাছাকাছি থাকবে যে, মানুষ তাদেরকে দেখতে পাবে, কিন্তু তারা মানুষকে দেখতে পাবে না। ইমাম মালেক রহ. (১৭৯হি.) ও ইমাম শাফেয়ী রহ. (২০৪হি.) এরও এই অভিমত।

(২) কারো মতে মুমিন জিনেরা আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে) থাকবে।

(৩) অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে মুমিন মানুষের মতো মুমিন জিনেরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তৃতীয় মতটিই বিশুদ্ধ। কেননা মানুষের মত জিনেরা যখন আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে আদিষ্ট, তখন আদেশ পালনের পুরস্কার স্বরূপ জান্নাতে প্রবেশ এবং নিষেধ অমান্যের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশের ক্ষেত্রেও মানুষের মত হওয়াই স্বাভাবিক। বিভিন্ন আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

আর যে ব্যক্তি নিজ রবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করতে থাকে, তার জন্য (বেহেশতে) দুটি উদ্যান থাকবে। অতঃপর হে জিন ও মানব! তোমরা তোমাদের রবের কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে। (সূরা রহমান- ৪৭)

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের জন্যও জান্নাত রয়েছে। কেননা تكذبان শব্দ দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জিন জাতিকে সম্বোধন করেছেন। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা রহমান- ১৩], আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ৬৮)

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) সূরা রহমান, সূরা কাহাফ, সূরা জিন প্রসঙ্গে বলেন,

هذه السورة والأحقاف وقل أوحي دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون مأمورون منهيون مثابون معاقبون كالإنس سواء، مؤمنهم كمؤمنهم، وكافرهم ككافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك.

এই সূরা (আর-রহমান), সূরা আহকাফ এবং সূরা জিন এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, (মানুষের মত) জিনেরাও মুকাল্লাফ, আদেশ নিষেধের শৃঙ্খলে তারাও আবদ্ধ। মানুষের মত তাদেরকেও তাদের ভালো-মন্দ কাজের উপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হবে। তাদের মুমিন এবং কাফেরদের প্রাপ্তি এবং পরিণতি ঠিক তাই হবে যা মুমিন মানুষ ও কাফের মানুষের ক্ষেত্রে হবে। পুরস্কারপ্রাপ্তি ও শাস্তিভোগের ক্ষেত্রে মানুষ ও জিনের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা রহমান- ৩৬])

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, উলূমুল হাদীস বিভাগ, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর

তাঁকে জানতেই হবে

খোন্দকার আলী ইমাম

এ এক অন্তহীন নোংরামি। চলছে শত শত বছর ধরে। ইসলামের নবীকে হেয় প্রতিপন্ন করতে যা যা করা প্রয়োজন তার কোনটিতেই পিছিয়ে নেই তারা। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন অনুযায়ী ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল- এই ১৫০ বছরে ইসলাম এবং এর নবীর বিরুদ্ধে বই লিখা হয়েছে অন্তত ৬০০০০ টি। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন একটিরও বেশী। আর্টিকেল লিখা হয়েছে অজস্র, আঁকা হয়েছে অগণিত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। সাম্প্রতিককালে, অর্থাৎ গত ১৫ বছরে এর মাত্রা বেড়েছে বহু গুণ। কিন্তু লাভ কি তাতে? ইসলামকে বা এর নবীকে কি ছোট করা গেছে? ২০০3 সালের গীনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস অনুযায়ী যে ধর্ম প্রতি বছর সবচেয়ে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে তা হচ্ছে 'ইসলাম'। আর ইসলামের নবী? সে প্রসঙ্গে আসার আগে একটু জেনে নেই ইসলামের নবীকে নিয়ে কারা করছে এসব সমালোচনা, কারা আঁকছে কার্টুন। এদের কথা বা কার্যকলাপকে কতটা গুরুত্ব দেয়া উচিত! পৃথিবীর সভ্য সমাজে তাদের অবস্থান কোথায়। এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে এসব লেখকদের চেয়ে অনেক বেশী সম্মানিত, মর্যাদায় অনেক বড় কিছু ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন তা আমাদের জানা প্রয়োজন। এসব মন্তব্যগুলো উল্লেখ করার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন '(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ্ব জগতের জন্য কেবল রহমত করেই পাঠিয়েছি'-(সূরা আম্বিয়া- ১০৭) অথবা 'এবং আমি আপনার কল্যাণে আপনার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি'-(সূরা ইনশিরাহ- ৪) অথবা 'এবং নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন'-(সূরা কলম- ৪)।

ফলে তাঁর সম্পর্কে মানুষের করা কোন প্রশংসাই অতি প্রশংসা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। কিন্তু এ মন্তব্যগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এসব মন্তব্য করেছেন এমন সব বিশ্বখ্যাত গুণীজন যারা মুসলমান নন। এসব মন্তব্যের মধ্য থেকে কয়েকটি এ রকম-

১৭০ বছর আগে ফরাসি ঐতিহাসিক লামার্টিন তার *HISTOIRE DE LA TURQUIE* গ্রন্থে মন্তব্য করেন 'যদি উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, সাধ্যের স্বল্পতা এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্য এই তিনটিকে মানব প্রতিভা যাচাইয়ের মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে কারো সাহস হবে কি আধুনিক ইতিহাসে মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে আর কোন শ্রেষ্ঠ মানুষের তুলনা করার?' দার্শনিক, বাগ্মী, বাণী-বাহক, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা সর্ব মতবাদের উপরে বিজয়ী, যুক্তিপূর্ণ বিশ্বাসের ও মূর্তিবিহীন ধর্মীয় মতবাদের প্রবর্তক তিনিই হচ্ছেন মুহাম্মদ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব পরিমাপের সম্ভাব্য যতগুলি মানদণ্ড ও মাপকাঠি বিদ্যমান- তার সবগুলোর বিচারে, আবারো বলছি সবগুলোর বিচারে, আমরা সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি যে, দুনিয়াতে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কোন মানুষ আছেন কি?

মাইকেল এইচ. হার্ট নামক আমেরিকান ঐতিহাসিক, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী *দি হান্ড্রেড* নামের একটি বই প্রকাশ করেছেন ১৯৭৮ সালে। মানব জাতির সর্বকালের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশী প্রভাব যারা ফেলেছেন তাদের সেরা ১০০ কে তিনি নিয়ে এসেছেন তার তালিকায়। নিজে খ্রিস্টান হয়েও এখানে তিনি ইসলামের নবীকে বিস্ময়করভাবে স্থান দিয়েছেন এক নম্বরে। 'যীশু খ্রিস্ট'-এর নাম এসেছে তিন নম্বরে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলছে, সকল ধর্মীয় নেতা ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে মুহাম্মদ ছিলেন সর্বাধিক সাফল্য অর্জনকারী।

দি জেনুইন ইসলাম গ্রন্থে (ভলিউম-১, ১৯৩৬) জর্জ বার্নার্ড শ' এর মত জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক এবং নাট্যকার বলেন, 'আমি তাঁকে (মুহাম্মদকে) পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেছি ... তিনি এক আশ্চর্য মানুষ। আমি বিশ্বাস করি তাঁর মত কাউকে যদি বর্তমান সমস্যাসংকুল পৃথিবীর দায়িত্ব দেয়া হতো, তাহলে তিনি এমনভাবে সবকিছুর সমাধান করতেন যাতে প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হয়। পৃথিবীর বুকে পদচারণা করেছেন এমন যে কোন ব্যক্তি থেকেই তিনি অনেক এগিয়ে।

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, আমি তাঁর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। আমি অতি নিশ্চিত যে, সে সময় ইসলাম মানব মনে যে আসন লাভ করেছিল তা তরবাবীর জোরে নয়। বরং এটি ছিল এই লোকটির চূড়ান্ত সরলতা, নিস্বার্থপরতা, তাঁর বন্ধু এবং অনুসারীদের জন্য গভীর মমত্ব, তাঁর নির্ভীকতা এবং তাঁর প্রভুর উপর এবং প্রভুর দেয়া কর্তব্য-কর্মে তাঁর অবিচল দৃঢ়তা। আমি যখন তার জীবনীর দ্বিতীয় ভলিউমটি শেষ করি আমার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল এজন্য যে, এই মহান জীবন সম্পর্কে আরো জানার জন্যে আমার কাছে আর কিছুই নেই।

তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, বিজ্ঞ শাসক, অসাধারণ বন্ধু, চমৎকার স্বামী, স্নেহশীল পিতা। একজন মানুষের ভেতর যতগুলো গুণের সমষ্টি থাকতে পারে তার সবগুলোই তার ভেতর ছিল।

কার্টুনিস্টদের নিরন্তর আক্রমণের কারণটি আসলে কি? বিশ্বজনসংখ্যার একটি বিশাল অংশের হৃদয়ে সবচেয়ে প্রিয় যে নামটি তাকে আক্রমণ করাটাই কেন এক ধরনের মানুষ জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে নিয়েছে? একজন মুসলিম গবেষক এর চমৎকার একটি উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এরা আসলে মানতে পারছে না কেন একজন নিরক্ষর মানুষ বিশ্বজুড়ে সর্বকালের সবচেয়ে সফল মানুষ, সবচেয়ে প্রিয় মানুষ, সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবেন। কেন মুসলমানরা এতটা আনুগত্য দেখাবে ১৪০০ বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়া একজন মানুষের প্রতি।'

তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন সেটি তো স্পষ্ট। কুরআনে আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে নিরক্ষর হিসেবে উল্লেখ করেছেন (সূরা আ'রাফ- ১৫৭)। খ্রিস্টান লেখক মার্গোলিয়থ স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, মুহাম্মদ তা আদৌ প্রাপ্ত হননি। এটি নিশ্চিত যে শৈশবে তাকে লিখতে ও পড়তে দেয়া হয়নি। পি.কে হিট্টি তার বিখ্যাত গ্রন্থ *The Arabs*-এ বলছেন, তিনি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে কখনও স্কুলে যাননি। তাহলে কি করে তিনি এমন একটি গ্রন্থের জন্য দায়ী হন যে গ্রন্থকে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশের অধিক মানুষ সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ধর্মতত্ত্বের আধার বলে মনে করে!

তারা নিশ্চিতভাবেই জানে যে, মুকুটধারী কোন সম্রাটই তাঁর মত আনুগত্য পায়নি, কোনদিন পাবেও না। এই 'কার্টুন' হচ্ছে সেই অন্তর্জ্বালারই বহিঃপ্রকাশ।

E-mail: aimam.kh12@gmail.com

ইবলিস ও জিন জাতি

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইবলিস

আল্লাহর নিকট ইবলিসের অবস্থান ছিল অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার। কিন্তু আল্লাহর আদেশের বিপরীত যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতার দরুণ এ সম্মান ও মর্যাদা পর্যবসিত হয়েছিল লাঞ্ছনা ও অভিসম্পাতে! ইমাম বাগাবী রহ. (৫১৬হি.) বলেন,

كان اسمه عزازيل بالسريانية وبالعربية الحارث فلما عصى غير اسمه وصورته فقيل إبليس لأنه أبلس من الرحمة أي : يئس والعياذ بالله.

ইবলিস শয়তানের নাম ছিল 'আযাযীল' (সুরিয়ানী ভাষা) এবং 'হারিস' (আরবী ভাষা)। যখন সে নাফরমানী করল তখন তার নাম এবং অবয়ব বিকৃত হয়ে গেল। নাম হল 'ইবলিস' (নিরাশ), কারণ সে আল্লাহর রহমত থেকে চিরদিনের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ৫/২৫৭)

ইবলিস জিন ছিল না কি ফেরেশতা?

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.

অর্থ : আর যখন আমি ফেরেশতাদের আদেশ দিলাম, আদমের সামনে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; ইবলিস ব্যতীত। সে জিন জাতিভুক্ত ছিল। কাজেই সে তার রবের আদেশ লঙ্ঘন করল। সুতরাং তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার চেলাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ আমাকে ছেড়ে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু! এটা অনাচারীদের জন্য নিকৃষ্ট বদল। (সূরা কাহাফ- ৫০)

আল্লাহর নাফরমানীর পূর্বে ইবলিস জিন ছিল, না ফেরেশতা ছিল? বিষয়টি উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধপূর্ণ। কাতাদা রহ. (১১৭হি.), যাহ্হাক রহ. (১০৬হি.), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ. (৯৪হি.), ইবনে জুরাইজ রহ. (১৫০হি.), যাজ্জাজ রহ. (৩৪০হি.), ইবনুল আম্বার রহ. (৩৩৪হি.), আবুল হাসান আশআরী রহ. (৩১৮হি.), আল্লামা তবারী রহ. (৩১০হি.), ইমাম নববী রহ. (৬৭৬হি.) ও আল্লামা কামালুদ্দীন দামেরী রহ. (৮০৮হি.) প্রমুখ উলামায়ে কেরামের মতে ইবলিস ফেরেশতা ছিল, বরং ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ও অধিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়াসহ প্রথম আসমানে ফেরেশতাদের সর্দার ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. (৬৮হি.), ইবনে মাসউদ রাযি. (৩২/৩৩হি.)-দের দিকে এ মতটি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/৮১, তারীখে তবারী ১/৫৬, তাফসীরে তবারী ১৫/৩০০, আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান; পৃষ্ঠা ১৭৫, হায়াতুল হায়াওয়ান; জিন অধ্যায়)

এ সকল উলামায়ে কেরাম উল্লেখিত আয়াত যাতে ইবলিসকে জিন বলা হয়েছে তার তিনটি ব্যাখ্যা করে থাকেন।

(১) جن শব্দটি جنة শব্দের থেকে উদ্ভূত। আর সে বেহেশতের উদ্যানসমূহের (পরিচর্যার) কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের দায়িত্বে ছিল। (ممن يعملون في الجنان) এ কারণে জান্নাতের (جنة) দিকে সম্পৃক্ত করে তাকে জিন (جنّ) বলা হয়েছে। (তাফসীরে তবারী ১৫/৩০১)

(২) ফেরেশতাদের অনেক শ্রেণী রয়েছে। যেমন কার্রুবিয়ূন, রূহানিয়্যূন, খাজানাহ, যাবানিয়াহ। তেমনি একটি শ্রেণী হল 'জিন'। ইবলিস এই 'জিন' শ্রেণীভুক্ত ছিল। (كان من حى الملائكة يقال لهم الجن)

এ কারণেই কুরআনে তাকে 'জিন' বলা হয়েছে। তবে সাধারণ জিনদের সাথে ফেরেশতাদের এই বিশেষ শ্রেণীর জিনদের পার্থক্য হল, সাধারণ জিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে من مارج من نار নিখাদ আগুন থেকে আর এই ফেরেশতা শ্রেণী জিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে من نار السموم আগুনবিশিষ্ট তীব্র লু হাওয়া থেকে। অন্যান্য সকল ফেরেশতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। (তারীখে তবারী ১/৫৮, আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ১৭৫)

(৩) অথবা আয়াতে তাকে জিন বলার কারণ হল, জিন শব্দের উৎসমূলের অর্থ হল, 'গোপন থাকা' (الاستار)। আর আয়াতে كان من الجن (সে জিন ছিল) এর অর্থ হল, كان مستترا من معصية الله من قبل هذا (ইতিপূর্বে আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে সে লুকিয়ে ছিল তথা অবাধ্যতা প্রকাশ পায়নি)। আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ১৭৫)

অপরদিকে মুহাক্কিকীন উলামায়ে কেরামের বড় একটি জামাআত ও জমহুর মুফাসসিরীনের অভিমত হল, ইবলিস জিন ছিল এবং তাকে সাধারণ জিনদের মত আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে অধিক ইবাদত এবং সুউচ্চ মর্যাদার ক্ষেত্রে আল্লাহর দরবারে তার বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং জিন হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতাদের মাঝে সে বিশেষ সম্মানিত ছিল।

এ সকল উলামায়ে কেরামের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ., হাসান বসরী রহ., ইবনে শিহাব যুহরী রহ., শাহর বিন হাওশাব রহ. এবং মুফাসসিরদের মধ্যে আল্লামা যামাখশারী রহ. (৫৩৮হি.), ইমাম রাযী রহ. (৬০৪হি.), আল্লামা কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.), আল্লমা ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.), আল্লমা আবু সাঈদ রহ. (৯৮২হি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ১/৮১, তাফসীরে তবারী ১৫/৩০১, তাফসীরে কাশ্শাফ ২/৬৯৯, আল কামেল ফিত-তারীখ ১/২৫, হায়াতুল হায়াওয়ান; পৃষ্ঠা ২৮২, আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ১৭৭, তাফসীরে কাবীর ২/২১২, ২১/১২৫)

ইবলিস ফেরেশতা ছিল না জিন? এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের উভয় শ্রেণীর দলীল প্রমাণ পর্যালোচনা দ্বারা জমহুরে মুফাসসিরীনের মতটিই (ইবলিস জিন ছিল; ফেরেশতা নয়) বিশুদ্ধ প্রমাণিত হয়।

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসীর রহ.*তাফসীরে ইবনে কাসীর* গ্রন্থে বলেন,

وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها، والله أعلم بحال كثير منها، ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذي بأيدينا, وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة.

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'সালাফ' থেকে অনেক বর্ণনাই পাওয়া যায়। যার অধিকাংশ হল ইসরাঈলী রেওয়ায়েত। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত নকল করা হয় কুরআন-হাদীসের আলোকে তার সত্যতা যাচাই করার জন্যে (নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করার জন্য নয়)। আর এ সকল বর্ণনার অধিকাংশেরই সত্যতা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে কিছু বর্ণনা তো কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট

বিপরীত হওয়ায় সুনিশ্চিত মিথ্যা বলে প্রমাণিত। আর কুরআনে কারীম ইসলামপূর্ব সমস্ত সংবাদ এবং বর্ণনা থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/১৭৪)

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা যামাখশারী রহ. (৫৩৮হি.) *তাফসীরে কাশ্‌শাফ* গ্রন্থে ইবলিসের জিন হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন,

وهذا الكلام المعترض تعمد من الله تعالى لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم. فما أبعد البون بين ما تعمده اللهِ، وبين قولٍ من ضادّه وزعم أنه كان ملكاً ورئيساً على الملائكة، فعصى، فلعن ومسخ شيطاناً، ثم ورّكه على ابن عباس.

পবিত্র কুরআনে كان من الجن (ইবলিস জিন ছিল) বলার পর ففسق عن امر ربه (ইবলিস তার প্রতিপালকের নাফরমানী করল) বাক্যটি বলার দ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হল, শয়তানের অবাধ্যতার কারণে ফেরেশতা কর্তৃক আল্লাহর অবাধ্যতা প্রকাশ পাওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করা (আর তা এভাবে যে, শয়তান ফেরেশতা ছিল না; বরং সে ছিল জিন)। সুতরাং ইবনে আব্বাসের মতকে ভিত্তি করে (যা তার থেকে সঠিকভাবে প্রমাণিত নয়) যারা বলে, 'শয়তান ফেরেশতা ছিল, ফেরেশতাদের সর্দার ছিল। এরপর আল্লাহর নাফরমানীর কারণে অভিশপ্ত হয়ে শয়তানে রূপান্তরিত হয়েছে'। তাদের প্রদেয় ব্যাখ্যা-বক্তব্য এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যের মাঝে রয়েছে অনতিক্রম্য ব্যবধান। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আল্লাহর যে উদ্দেশ্য তার সাথে তাদের এ ব্যাখ্যার কোন মিল নেই। (তাফসীরে কাশ্‌শাফ ২/৬৯৯)

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (৬০৪হি.) *তাফসীরে কাবীর* গ্রন্থে 'ইবলিস ফেরেশতা ছিল' মতের স্বপক্ষে উপস্থাপিত দলীলের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণপূর্বক অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে 'ইবলিস জিন ছিল' মতটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি এ মতের পক্ষে মোট পাঁচটি দলীল উল্লেখ করেছেন-

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ.

অর্থ : যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। (সূরা কাহাফ- ৫০)

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইবলিস জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব তার ফেরেশতা হওয়াটা সম্ভব নয়। কেননা ফেরেশতা এবং জিন সম্পূর্ণ ভিন্ন দু'টি জাতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ.

অর্থ : যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো? ফেরেশতারা বলবে, আপনি পবিত্র, আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়, বরং তারা জিনদের পূজা করতো। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশ্বাসী। (সূরা সাবা- ৪০, ৪১)

(২) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ.

অর্থ : সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছো? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা যালিমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল। (সূরা কাহাফ- ৫০)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইবলিসের সন্তান-সন্ততি হয়। আর সন্তানাদি জিনদের হয়, যেহেতু তাদের মধ্যে নারী-পুরুষ রয়েছে এবং তাদের বিয়েও হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের সন্তানাদি হয় না। কারণ তারা নারী-পুরুষের শ্রেণীভেদ থেকে পবিত্র।

(৩) ফেরেশতারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

অর্থ : তারা (ফেরেশতারা) আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানী করে না। বরং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তাই করে। (সূরা তাহরীম- ৬)

অথচ শয়তান আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং হযরত আদম আ. কে সিজদা করেনি।

(৪) ইবলিস আগুনের তৈরি। যেমন সে বলেছিল,

خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ.

অর্থ : সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (সূরা সোয়াদ- ৭৬)

অথচ ফেরেশতারা হলেন নূরের তৈরি। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৯৯৬ কিতাবুয যুহ্‌দ)

(৫) ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর বার্তাবাহক। ইরশাদ হচ্ছে,

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহকরূপে প্রেরণ করেন। (সূরা ফাতির- ১)

আর বার্তাবাহকেরা নিষ্পাপ হয়ে থাকে। অথচ ইবলিস হল অভিশপ্ত। (তাফসীরে কাবীর ২/২১২-২১৪)

ইবলিস সম্পর্কে এ ধারণা করা যে, 'আল্লাহর অবাধ্যতার পূর্বে ইবলিস ফেরেশতা ছিল, বরং ফেরেশতাদের সর্দার ছিল'। দলীল প্রমাণের আলোকে এ ধারণা সঠিক নয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তবে এটা ঠিক যে, জিন হওয়া সত্ত্বেও সে আল্লাহর ইবাদত করা এবং সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে সে ফেরেশতাদের সমপর্যায়ে ছিল। এ কারণে সিজদার আদেশের ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের সাথে সেও আদিষ্ট ছিল। (আল মাজমূআতুস সানিয়্যাহ; পৃষ্ঠা ৫৬২, তাফসীরে কাবীর ২/২১৪)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

(১) জিনেরা কি ইবলিসের বংশধর?

এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রহ. (১১২৭হি.) *তাফসীরে রূহুল বয়ান* গ্রন্থে উলামায়ে কেরামের তিনটি মত উল্লেখ করেছেন-

(ক) হযরত হাসান বসরী রহ. (১১০হি.) এর মত হল, ইবলিস জিনদের আদি পিতা, যেমন হযরত আদম আ. মানুষের আদি পিতা।

(খ) কারো মতে ইবলিস জিনদের বংশধর। আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. এর পূর্বে পৃথিবীতে জিন জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। জিনেরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। ফেরেশতারা তাদেরকে লোকালয় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইবলিস সে জিনদেরই বংশধর ছিল।

(গ) আল্লাহ তা'আলা একটি জাতিকে সৃষ্টি করে হযরত আদম আ. কে সিজদা করতে বললে তারা অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের সৃষ্টি করে সিজদার হুকুম দিলে তারা তা পালন করল। কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, যেহেতু সে পূর্বোক্ত জাতিভুক্ত ছিল। (তাফসীরে রূহুল বয়ান ৫/২৫৭)

হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। (হায়াতুল হায়াওয়ান; পৃষ্ঠা ২৮০)

জিন জাতি

জিন জাতি আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি। কেননা দেহাবয়বসহ তাদের সকল

বৈশিষ্ট্যের উৎস হল আগুন। এতদসত্ত্বেও তারা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। এরপর জিন এবং তারপর মানব জাতি সৃষ্টি করেন। আল্লামা তবারী (৩১০হি.) হযরত রবী' ইবনে আনাস রহ. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

إن الله خلق الملائكة يوم الاربعاء وخلق الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন বুধবার, জিন সৃষ্টি করেছেন বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার। (তারীখে তবারী ২/৫৮)

জিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা কামালুদ্দীন দামেরী রহ. (৮০৮হি.) *হায়াতুল হায়াওয়ান* গ্রন্থে বলেন,

الجن أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة، لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة. وهم خلاف الإنس. الواحد جني ويقال إنما سميت بذلك لأنها تتقى ولا ترى.

অর্থ : জিন এমন এক সৃষ্টি যাদের অবয়ব এবং শারীরিক গঠন বাতাস প্রকৃতির। তারা বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতি ধারণ করতে পারে। চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধি-বিবেচনাবোধও তাদের রয়েছে। কঠিন থেকে কঠিনতর কাজে তারা পারঙ্গম। তারা মানুষের বিপরীত একটি জাতি। এক বচন جِنِّيٌّ। তাদের এ নামকরণের কারণ হল, তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না।

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) *তাফসীরে কুরতুবী* গ্রন্থে বলেন,

وسمي جانا لتواريه عن الأعين.

অর্থ : জিনকে 'জিন' নামকরণ করা হয়েছে (যেহেতু তার শাব্দিক অর্থ গোপন থাকা) আর সে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। (তাফসীরে কুরতুবী ১০/২৩)

জিন কী জিনিস দ্বারা তৈরি

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ.

অর্থ : আর জিনকে আমি সৃষ্টি করেছি (আদমের) পূর্বে আগুন থেকে যা উত্তপ্ত বায়ু ছিল। (সূরা হিজর- ২৭)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ.

অর্থ : আর তিনি জিনকে খাঁটি আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রহমান- ১৫)

এ দু'টি আয়াত দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) *তাফসীরে কুরতুবী* গ্রন্থে বলেন,

ويروى أن الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى ، فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار السموم فخلق منها إبليس.

অর্থ : বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা দু'টি আগুন সৃষ্টি করলেন। একটিকে আরেকটির উপর ছেড়ে দিলেন। ফলে একটি অপরটিকে খেয়ে ফেলল। আর সেটিই হল نار السموم (আগুনবিশিষ্ট লু হাওয়া)। অতঃপর তা থেকে ইবলিসকে সৃষ্টি করলেন। (তাফসীরে কুরতুবী ১৭/১৪১)

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

সীমিত জ্ঞানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আগুন থেকে কাউকে জীবন দান করা কিভাবে সম্ভব?

কিন্তু একজন মুমিনের জন্য এ বিশ্বাস অপরিহার্য যে, মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনা এবং চিন্তাশক্তি অত্যন্ত সীমিত। অনেক ক্ষেত্রেই তা আলো-আঁধারীর মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে সক্ষম হয় না। আর তখনই প্রয়োজন হয় 'ওহী'র আলোর। যা একজন খাঁটি মুমিনকে চিন্তার অনতিক্রম্য তীহ প্রান্তর থেকে তুলে এনে তাকে তার নিশ্চিন্ত কর্মপন্থা বাতলে দেয়।

يقولون امنا به كل من عند ربنا.

... আমরা তো বিশ্বাস করি; সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।

আর তাই উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (৬০৪হি.) *তাফসীরে কাবীর* গ্রন্থে বলেন,

هذا على مذهبنا ظاهر، لأن البنية عندنا ليست شرطاً لإمكان حصول الحياة، فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد، فكذلك يكون قادراً على خلق الحياة والعقل في الجسم الحار.

এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের) বিশ্বাসমতে সুস্পষ্ট। কেননা আমাদের নিকট 'প্রাণের অস্তিত্বের জন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ তা'আলা একটি জড় বস্তুতে প্রাণ সঞ্চারে সক্ষম, তেমনি একটি উত্তপ্ত অবয়বেও প্রাণ দানে সক্ষম। (তাফসীরে কাবীর ১৯/১৫০)

জিনের প্রকারভেদ

ফেরেশতাদের মত জিনেরও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নাইসাবুরী রহ. (৪০৫হি.) তার *আলমুসতাদরাক আলাস সহীহাইন* গ্রন্থে হযরত সা'লাবা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الجن ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وكلاب وصنف يحلون ويظعنون.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح.

জিন তিন প্রকার: (১) যাদের ডানা রয়েছে এবং ডানার সাহায্যে তারা বাতাসে ভেসে বেড়ায়, (২) যারা সাপ ও কুকুরের আকৃতিতে থাকে ও (৩) যারা যমীনে অবতরণ করে ও যমীনে বসবাস করে। (মুসতাদরাকে হাকেম; হা.নং ৩৭০২)

এই জিন জাতির মধ্য থেকে যারা মুমিন তাদেরকে বলা হয় 'জিন'। আর যারা কাফের তাদেরকে বলা হয় 'শয়তান'। এ প্রসঙ্গে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (৬০৪হি.) *তাফসীরে কাবীর* গ্রন্থে বলেন,

والأصح أن الشياطين قسم من الجن، فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لايسمى بالشيطان، وكل من كان منهم كافراً يسمى بهذا الإسم.

বিশুদ্ধ মতানুযায়ী শয়তান জিনদেরই একটি শ্রেণী। মুমিন জিনদেরকে শয়তান বলা হয় না; বরং কাফের জিনদের শয়তান বলা হয়। (তাফসীরে কাবীর ১৯/১৪৯)

শয়তানপ্রকৃতির জিনদের মধ্যে আরেক শ্রেণী রয়েছে, যাদেরকে غيلان (গীলান, বাংলায় 'ভূত') বলা হয়। আরবদের ধারণানুযায়ী غيلان (ভূত) হল দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান জিন, যারা রাস্তাঘাটে ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করে পথচারীকে ভয় দেখিয়ে থাকে; কখনো মেরেও ফেলে। (আন নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ৩/৩৫৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে غيلان (ভূত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবীজী বললেন, هم سحرة الجن (এরা হল জিনদের জাদুকর শ্রেণী)। (মাকায়িদুশ শায়তান লিইবনি আবিদ দুনইয়া; হা.নং ৩, মউসূ'আতুল ইমাম আবিদ দুনইয়া ৪/৩২৮)

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. বলেন, غول (ভূত) দেখলে আমাদেরকে (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে) নামায (তথা আল্লাহর যিকর, আয়াতুল কুরসী ইত্যাদি) দ্বারা উচ্চ আওয়াজ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে বাযযার; হা.নং ১২৪৭, আন নিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ৩/৩৫৫)

জিনদের কিছু বৈশিষ্ট্য

(১) আকৃতি পরিবর্তন : জিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হল (আল্লাহর হুকুমে) তারা

মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর আকৃতি ধারণ করতে পারে। আল্লামা বদরুদ্দীন শিবলী রহ. (৭৬৯হি.) *আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান* গ্রন্থে বলেন,

لا شك ان الجن يتطورون ويتشكلون فى صور الانس والبهائم فيتصورون فى صور الحيات والعقارب وفى صور الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير.

কোন সন্দেহ নেই, জিনেরা বাতাসে ভেসে বেড়ায় এবং মানুষ, জন্তু যেমন: সাপ, বিচ্ছু, উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা ইত্যাদির আকৃতি ধারণ করে। (আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ২৮)

বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. বর্ণনা করেন, ...ইমাম সুদ্দী রহ. (১২৭হি.) আয়াতে কারীমা (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. অর্থাৎ আর স্মরণ করুন, যখন কাফেররা আপনার সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করছিল যে, আপনাকে বন্দি করে রাখবে। হত্যা করে ফেলবে কিংবা দেশান্তর করে দেবে।) এর প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে বলেন,

'মদীনার আনসাররা ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশের নেতৃস্থানীয় কাফেররা যখন (ইসলামকে রুখে দেয়ার হীন মানসে) দারুন নদওয়ায় শলাপরামর্শে বসল তখন 'নাযদ' নিবাসী একজন প্রবীণের আকৃতিতে সেখানে ইবলিস শয়তান এসে উপস্থিত হল ... (এবং পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধভাবে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার পরামর্শ দিল। (তাফসীরে তবারী [সূরা আনফাল- ৩০])

খাদ্য গ্রহণ

জিনেরা খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। কাজী আবু ইয়ালা রহ. বলেন,

والجن يأكلون ويشربون ويتناكحون كما نفعل.

অর্থ : জিনেরা আমাদের মতই খাবার গ্রহণ করে এবং তাদের পরস্পরে বিয়েও হয়। (আকামুল মারজান; পৃষ্ঠা ৩৯)

সহীহ মুসলিমের 'কিতাবুস সালাত' অধ্যায়ে হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, 'একরাতে জিনেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করল। কুরআন তিলাওয়াত শুনলো। ফিরে যাওয়ার পূর্বে জিনেরা নিজেদের খাবারের প্রসঙ্গ তুললে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم.

বিসমিল্লাহ বলে জবাইকৃত প্রাণীর হাড্ডি যখন তোমরা হাতে নিবে, তখন তা পূর্বের চেয়েও অধিক গোশতসম্পন্ন হবে আর পশুর মল হল তোমাদের জানোয়ারের খাবার। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৪৫০)

বিবাহ ও সন্তান-সন্ততি

জিনেরা মানুষের মতই বিয়ে করে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও হয়। নিম্নোক্ত আয়াতই এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ.

অর্থ : অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। (সূরা কাহাফ- ৫০)

জিনেরাও শরীয়ত মানতে আদিষ্ট

মানুষের মত জিন জাতিও আল্লাহর হুকুম পালনে আদিষ্ট। পবিত্র কুরআন মাজীদে সূরা আর-রাহমানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অর্থ : অতএব, তোমরা উভয়ে (জিন এবং মানব) তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? (সূরা রহমান- ৫৭)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ. (৬০৪হি.) উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন,

اطبق الكل على أن الجن كلهم مكلفون.

উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মত হল, জিনেরা মুকাল্লাফ অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালনে আদিষ্ট। (তাফসীরে কাবীর [সূরা আর-রাহমান- ৫৭])

জিনদের মধ্যে কি নবী প্রেরণ করা হয়েছে?

জিনেরা আল্লাহর হুকুম পালনে আদিষ্ট এ ব্যাপারটির মতো উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারেও একমত যে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষ ও জিন জাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।

কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল জিনদের কথা উল্লেখ করেছেন যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন শুনে নিজেদের কওমকে দাওয়াত দিয়েছিল।

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.

অর্থ : হে আমাদের কওম! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) ডাকে সাড়া দাও এবং তার উপর ঈমান আন। (সূরা আহকাফ- ৩১)

ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

وهذا يدل على انه كان مبعوثا الى الجن والانس.

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল জিন ও মানুষের কাছে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা আহকাফ- ৩১])

হযরত জাবের রাযি. সূত্রে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلى كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل احمر واسود.

আমাকে পাঁচটি জিনিস এমন দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। ইতোপূর্বে প্রত্যেক নবী কেবল তার গোত্রের জন্য প্রেরিত হত, আর আমাকে প্রত্যেক লাল ও কালোর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫২১)

হযরত মুজাহিদ রহ. (১০১হি.) احمر واسود এর ব্যাখ্যায় বলেন,

الأحمر والأسود : الجن والإنس.

অর্থাৎ এ দুটির অর্থ হল, জিন এবং মানব। (তাফসীরে কুরতুবী [সূরা আহকাফ- ৩১])

হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে জিনদের মাঝে কোন জিনকে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে।

যাহ্হাক রহ. (১০৬হি.) এর মতে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বে জিনদের মাঝে জিনকেই নবী হিসেবে প্রেরণের ধারা অব্যাহত ছিল। তবে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., ইবনে জুরাইজ, মুজাহিদ, কালবী, আবু উবাইদ, ওয়াহিদী রহ.সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হল 'কোন জিনকে নবী বা রাসূল হিসেবে কখনো প্রেরণ করা হয়নি। তবে জিনদের মধ্যে 'দাঈ' (দীনের দাওয়াত প্রদানকারী) ছিল। যারা মানুষের মাঝে প্রেরিত নবীদের থেকে হুকুম আহকাম শুনে গিয়ে নিজেদের কওমকে দাওয়াত দিত।

এ মতটিই বিশুদ্ধ। মুফাসসির ইমাম কুরতুবী রহ. (৬৭১হি.), ইমাম জারীর তবারী রহ., ইমাম ইবনে কাসীর রহ. (৭৭৪হি.), জমহুর উলামায়ে কেরামের মতটিকেই সঠিক বলেছেন। (তাফসীরে তবারী [সূরা আনআম- ১৩০],

(২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এ যুগের মাসাইল

শরয়ী বিধানে প্রাণীর ছবি-৪

মাওলানা মাকসূদুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছবির ব্যবহার এবং সংরক্ষণের বিধান

পূর্বের আলোচনায় দলীল প্রমাণের আলোকে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে, সব ধরনের ছবি অঙ্কন করা এবং তৈরি করা হারাম। ঠিক একই হুকুম ছবি রাখার ক্ষেত্রে। শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘরে বা নিজের কাছে ছবি রাখা নাজায়েয। তবে দুই ধরনের ছবির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ রয়েছে যে, কেউ রাখলে কি হারাম ছবি রাখার গুনাহ হবে?

এক. যে ছবি অপদস্ত অবস্থায় থাকে অথবা সেটার ব্যবহার পদ্ধতিই হলো অযত্ন এবং অবহেলাকর।

দুই. যে ছবি এত ছোট যে, নিচে থাকাবস্থায় দাঁড়ানো ব্যক্তি পরিষ্কারভাবে ছবির অঙ্গ-প্রতঙ্গ দেখতে সক্ষম হয় না।

অপদস্ত ছবির বিষয়ে দলীলভিত্তিক আলোচনা

ইমাম তহাবী রহ. এ ব্যাপারে দু'টি মাযহাব বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

فذهب ذاهبون إلى كراهية إتخاذ ما فيه الصور من الثياب وما كان يوطأ من ذلك ويمتهن وما كان ملبوسا وكرهوا كونه في البيوت.

অর্থ : অনেক উলামায়ে কেরাম এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, যে কাপড়ে ছবি থাকে এবং যে ছবি পদদলিত বা অপদস্ত অবস্থায় ব্যবহার হয় কিংবা ছবিবিশিষ্ট কাপড়টি পরিধেয় বস্ত্র এ সব সূরতে ছবির ব্যবহার হারাম। এমন কাপড় ঘরে রাখাও নাজায়েয।

এ মতের প্রবক্তাদের দলীল হল,

لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.

(ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করে না যেখানে প্রাণীর ছবি থাকে) এবং এ অর্থের অন্যান্য হাদীসসমূহ।

ইমাম তহাবী অপর যে মাযহাব বর্ণনা করেছেন তা হল,

ما كان من ذلك يوطأ ويمتهن فلا بأس به وكرهوا ما سوى ذلك.

অর্থ : যে ছবি পদদলিত কিংবা অপদস্ত অবস্থায় ব্যবহার হয় তা কারো কাছে থাকলে ছবি রাখার গুনাহ হবে না। এছাড়া অন্যান্য ছবি রাখা হারাম। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৭৮৫)

এ মতের প্রবক্তাদের কয়েকটি দলীল এখানে তুলে ধরা হল-

عن عائشة انه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى إليه فقال اخريه عنى قالت فاخرته فجعلته وسائد.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, ছবি বিশিষ্ট একটি কাপড় ছোট তাকের উপর প্রসারিত ছিল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিকে ফিরে নামায পড়তেন। তিনি বললেন, এটা সামনে থেকে সরাও। আমি সেটা সরিয়ে নিলাম এবং বালিশ বানিয়ে নিলাম। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২১০৭, শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৭৯১)

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود انه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سهل بن حنيف فدعا أبو طلحة انسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه اطيب لنفسي.

অর্থ : হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আবু তালহা আনসারী রাযি. (অসুস্থ থাকায়) তাকে দেখতে গেলেন। উবাইদুল্লাহ বলেন, তিনি আবু তলহার কাছে সাহল ইবনে হানীফকে দেখতে পেলেন। আবু তালহা রাযি. যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন এক ব্যক্তিকে ডেকে সেখান থেকে বিছানা সরাতে বললেন। অবস্থাদৃষ্টে সাহল ইবনে হানীফ বললেন, বিছানা অপসারণ করা হচ্ছে কেন? আবু তালহা রাযি. বললেন, এতে ছবি রয়েছে। আর এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তাতো আপনার জানাই আছে। সাহল রাযি. বললেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ছবির নিষিদ্ধতার ব্যাপারে) কি এ কথা বলেননি 'তবে কাপড়ে যে নকশা করা হয় তা এ হুকুম বহির্ভূত'। আবু তালহা বললেন, (আপনার কথা সঠিক) কিন্তু সব ধরনের ছবি ব্যবহার পরিহার করা আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়। (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ৭৮৫)

ইমাম বাজী রহ. বলেন,

امر ابى طلحة بازالة النمط لاجل التصاوير دليل على كراهيته له.

অর্থ : আবু তালহা রাযি. এর ছবিবিশিষ্ট কাপড় সরাতে বলা এ কথার প্রমাণ যে, তার নিকট অপদস্ত ছবি রাখাও অপছন্দনীয়। (আল মুনতাকা ৯/৪৩৬)

ইমাম মুহাম্মাদ এই হাদীস উল্লেখ করে বলেন,

وبهذا نأخذ ما كان فيه من تصاوير من بساط يبسط أوفراش يفرش أووسادة فلا بأس بذلك. إنما يكره من ذلك في الستر وما ينصب نصبا. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

অর্থ : এই হাদীসের ভিত্তিতে আমরা এ মত গ্রহণ করেছি যে, ছবিবিশিষ্ট বিছানা কিংবা ফরাশ অথবা বালিশ ব্যবহারে কোন অসুবিধা নেই। ব্যবহার হারাম হল ছবিবিশিষ্ট পর্দা এবং যে ছবি কোথাও সাঁটানো হয়। এটা আবু হানীফা এবং আমাদের অধিকাংশ ফকীহর মত। (মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ)

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

فأما ما كان يوطأ ويمتهن ويفرش فهو خارج من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

অর্থ : যে ছবি পদপিষ্ট হয়, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সাথে ব্যবহৃত হয় এবং বিছানো হয় তা নিষিদ্ধতার হুকুম বহির্ভূত। এটি আবু হানীফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ রহ. এর মাযহাব। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৭৯৪, ফাতহু বাবিল ইনায়া ১/৩১১, মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ৪/৩৭৯)

হযরত লাইস বিন সাদ এর বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, হযরত সালেম রহ. এর মাযহাবও অবৈধ না হওয়ার পক্ষে। তিনি বলেন,

رأيت سالم بن عبد الله متكئا على وسادة حمراء فيها تماثيل فقلت له فقال إنما يكره هذا لمن ينصبه ويصنعه.

অর্থ : সালেম ইবনে আব্দুল্লাহকে ছবি বিশিষ্ট বালিশে টেক লাগানো অবস্থায় দেখে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি বললেন, নিষেধ হল যা টানানো হয় এবং যা তৈরি করা হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২৫৭৯৬)

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী শাইবা হযরত উরওয়া, ইকরামা, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আতা, যুহরী, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ থেকে অনুরূপ কর্ম এবং মত উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত দেখতে উক্ত কিতাবের ২৫৭৯৪ থেকে ২৫৮১১ পর্যন্ত হাদীসগুলো দেখা যেতে পারে।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত জিবরাইল আ. বলেন,

كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ.

অর্থ : এমন ঘরে কিভাবে প্রবেশ করব যেখানে ছবিবিশিষ্ট পর্দা রয়েছে! হয় তুমি ছবির মাথা কেটে দাও অথবা বিছানা বানিয়ে নাও যা পদদলিত করা হবে। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৫৩৬৫)

ছোট ছবি যা নিচে পড়ে থাকাবস্থায় দাঁড়ানো ব্যক্তি স্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হয় না তার হুকুম

ছোট ছবি যা নিচে পড়ে থাকাবস্থায় দাঁড়ানো ব্যক্তি ছবির অঙ্গ-প্রতঙ্গ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে না তা ঘরে থাকলে বা রাখলে অধিকাংশ উলামায়ে

কেরামের মতে ছবি সংরক্ষণের গুনাহ হবে না। আল্লামা হাসকাফী রহ. বলেন,

أوكانت صغيرة لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الارض.

অর্থ : যমীনে রাখা এমন ছোট ছবি দাঁড়ানো অবস্থায় যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার বোঝা যায় না। (এমন ক্ষেত্রে ছবি রাখার গুনাহ হবে না)। (আদদুররুল মুখতার ১/৬৪৮)

আল্লামা শামী এ ব্যাপারে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পূর্বে *আদদুররুল মুখতার*-এর যে পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে তার টিকায় বিস্তারিত দেখা যেতে পারে।

উল্লিখিত মাসআলার স্বপক্ষে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত হাদীস এবং আসার গ্রন্থে পাওয়া যায়। হযরত নুমান ইবনে মুকরিন সম্পর্কে বর্ণিত,

كان نقش خاتم النعمان بن مقرن إيلا قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى.

অর্থ : হযরত নুমান বিন মুকরিনের আংটিতে উটের (ছোট) চিত্র ছিল। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৬৪৭)

হযরত কাসেম থেকে বর্ণিত,

كان نقش خاتم عبد الله ذبابان.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহর আংটিতে মাছির আকৃতি অঙ্কিত ছিল। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৬৪৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ বর্ণনা করেন,

كان نقش خاتم حذيفة كركيان.

অর্থ : হযরত হুযাইফার আংটিতে সারস জাতীয় পাখির (ক্ষুদ্র) আকৃতি ছিল। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৬৪৯)

এ সকল বর্ণনার ভিত্তিতে একেবারে ক্ষুদ্র আকৃতির ছবি ঘরে থাকলে ফুকাহায়ে কেরাম তা হারাম না হওয়ার কথা বলেছেন।

তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ছবিও ঘরে রাখা ঠিক নয়।

হযরত হাসান রহ. থেকে বর্ণিত,

كان يكره ان ينقش الرجل على خاتمه صورة.

অর্থ : তিনি ছবিবিশিষ্ট আংটি নিষিদ্ধ মনে করতেন।

যে কারণে ছবির ব্যবহার এবং সংরক্ষণ হারাম

পূর্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, যেমনিভাবে ছবি তৈরি করা হারাম, তেমনি তা সংরক্ষণ করাও হারাম। তবে এর মধ্য থেকে দুই ধরনের ছবি উক্ত হুকুম বহির্ভূত। এর কারণ হল, ফুকাহায়ে কেরাম যে কারণে ছবির ব্যবহার হারাম বলেছেন এক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। ফুকাহায়ে কেরাম ছবি ব্যবহার বা সংরক্ষণ হারাম হওয়ার ইল্লত (Cause) বলেছেন, যদি ব্যবহারিক জীবনে ছবির সম্মানজনক ব্যবহার কিংবা সম্মানজনক সংরক্ষণ হয় অথবা ব্যবহারটি تشبه بمن يعبد الصور ছবি-পূজারিদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয় তাহলে সে ব্যবহার হারাম। এ ব্যাপারে বিশিষ্ট ফকীহদের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল-

আল্লামা ইবনে কুদামা (মৃত ৬২০হি.) বলেন,

لأنها إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا تكرم.

অর্থ : ছবি যখন মাড়ানো হয়, অপদস্ত করা হয়, তার সম্মান এবং প্রশংসাসূচক ব্যবহার না হয়, তখন সেটা সেই প্রতিমার মত (হারাম) হবে না যার উপাসনা করা হয় এবং যাকে উপাসনার বস্তু বানানো হয়। (আল মুগনী ১০/২০০)

ইমাম সারাখসী রহ. (মৃত ৪৯০হি.) বলেন,

إذا كانت الصورة على الحائط الذى هو خلف المصلي فالكراهة فيه أيسر لان معنى التعظيم والتشبيه بمن يعبد الصور تنعدم هنا وكذلك ان كانت الصورة على الارض والازر والستور وأما على البساط فنقول اتخاذ الصورة على البساط مكروه ولكن لا بأس بالنوم والجلوس عليه لان البساط يوطأ فلا يحصل فيه معنى التعظيم.

অর্থ : ছবি যদি নামাযীর পেছনের দেয়ালে সাঁটানো থাকে সেক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হওয়ার কঠিন হুকুম প্রযোজ্য হবে না। নিষিদ্ধের মাত্রা হালকা হয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিমাপূজারীদের মত ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন পাওয়া যায় না...। বিছানায় যদি ছবি থাকে তবে ছবি রাখার গুনাহ হবে। কিন্তু ছবির উপর ঘুমানো ও বসাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ বিছানা দলিত করা হয়, তাই এক্ষেত্রে সম্মান প্রদর্শন পাওয়া যায় না। (আল মাবসূত ১/৩৭৪)

ইমাম শাফেয়ী রহ. (মৃত ২০৪হি.) বলেন,

إن رأى صورا في الموضع الذى يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذى تلك الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله.

অর্থ : আহুত স্থানে যদি প্রাণীর ছবি থাকে এবং তা সেখানে টানানো থাকে তাহলে সে স্থানে প্রবেশ করবে না। আর যদি ছবিটি সেখানে মাড়ানো অবস্থায় হয় তবে প্রবেশ করতে কোন শরয়ী বাধা নেই। (কিতাবুল উম ৭/৪৫২)

অতএব যে সকল সূরতে ছবির ব্যবহার বা সংরক্ষণে ছবির প্রতি সম্মানবোধ বুঝে আসে সে সব সূরতে ছবি সংরক্ষণ করলে হারাম ছবি ব্যবহারের গুনাহ হবে।

আমাদের সমাজে ঘরে বা অফিসে ছবি টাঙানো কিংবা আলমারী বা অ্যালবামে সংরক্ষণের যে প্রচলন রয়েছে তা নিশ্চিতভাবে হারামের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম তহাবী রহ. বলেন,

ثبت أن المنهي عنه الصور التي هي نظير ما يفعله النصارى في كنائسهم من الصور في جدرانها ومن تعليق الثياب المصورة فيها.

অর্থ : নিষিদ্ধ ছবি হল, খ্রিস্টানরা তাদের উপাসনালয়ে যেভাবে ছবি ব্যবহার করে সেভাবে ছবির ব্যবহার বা সংরক্ষণ করা। যেমন দেয়ালে আঁকা ছবি এবং ছবিযুক্ত পর্দা টানানো। (শরহু মা'আনিল আসার; হা.নং ৬৭৯৪)

ছবিযুক্ত মুদ্রা রাখার বিধান

মুসলিম অমুসলিম প্রায় সকল দেশে মুদ্রায় নিজ দেশের কোন বিশেষ ব্যক্তির ছবি ছাপানোর প্রচলন রয়েছে। এক্ষেত্রে শরয়ী বিশ্লেষণ হল, প্রচলিত পয়সাতে যে ছবি ছাপা হয় সাধারণত তা স্পষ্ট ছবি হয় না, ভালো করে লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। তাই এ জাতীয় পয়সা সাথে রাখতে শরয়ী কোন বাধা নেই। কিন্তু টাকার মধ্যে যে আকারের ছবি ছাপা হয় তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও এ ধরনের কারেন্সি সাথে রাখা যাবে। আর ছবি সাথে রাখার দায়ভার মুদ্রায় ছবি যুক্ত করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর বর্তাবে। সৌদি আরবের ইফতা বোর্ডের ফতওয়া এখানে তুলে ধরা হল,

س: هناك أمور تقلقني كثيرا ومنها مسألة الصور التي على النقود فقد ابتلينا بها ودخلت المساجد في جيوبنا فهل دخولها إلى المساجد مما يسبب هرب الملائكة عنها فيحرم إدخالها؟ وهل تعتبر من الأشياء الممتهنة؟ ولا تمنع الصور الممتهنة دخول الملائكة إلى البيوت.

ج: صور النقود لست متسببا فيها وأنت مضطر إلى تملكها وحفظها في بيتك أو حملها معك للانتفاع بها بيعا وشراء وهبة وصدقة وتسديد دين ونحو ذلك من المصالح المشروعة فلا حرج عليك، وليست ممتهنة، بل مصونة تبعا لصيانة ما هي فيه من النقد، وإنما ارتفع الحرج عنك من أجل الضرورة.

অর্থ : মুদ্রায় যে ছবি থাকে তা ফেরেশতাদের চলে যাওয়ার কারণ হবে না। কারণ তোমার জন্য (প্রশ্নকর্তা উদ্দেশ্যে) এ মুদ্রার মালিক হওয়ার কোন বিকল্প নেই এবং তুমি তা ঘরে সংরক্ষণ করতে বাধ্য অথবা বেচাকেনা, দান-সদকা, ঋণ পরিশোধ এবং শরীয়ত অনুমোদিত উপকার লাভের জন্য তোমাকে তা বহন করতে হবেই। তাই এতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। তবে এই বিধান মুদ্রায় ছাপা ছবিটি পদদলিত ছবির হুকুমে হওয়ার কারণে নয়। কেননা (মুদ্রাসংশ্লিষ্ট হওয়ায়) মুদ্রার মত ছবিটিকেও যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে ছাড়ের কারণ হল, প্রয়োজনীয়তা। (ফাতাওয়াল লাজনাতুদ দায়িমা লিলবুহূসিল ইলমিয়্যাহ ওয়ালইফতা ১/৪৮৫)

উল্লেখ্য, ছবি ছোট হলে যদিও তা রাখা হারাম নয়, কিন্তু এ ধরনের ছবি বানানো নিঃসন্দেহে হারাম।

স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এ্যালবামে ছবি রাখা জায়েয নেই।

আল্লামা বিন বায বলেন,

لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها.

অর্থ : কোন মুসলমানের জন্য স্মৃতি ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ছবি সংরক্ষণ করা বৈধ নয়; বরং তা নষ্ট করে ফেলতে হবে। (মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায ১/২২৫)

ছবিযুক্ত কামরায় নামায পড়ার বিধান

পায়ের নিচে ছাড়া কামরার (রুমের) যেদিকেই ছবি থাকুক সে ঘরে নামায পড়া মাকরূহ। তবে ছবি সামনে থাকলে নিষিদ্ধের মাত্রা যে পরিমাণ থাকবে পিছনে থাকলে সে মাত্রা আরো কমে যাবে। রুমে ছবিযুক্ত পত্র-পত্রিকা থাকলে তা কিছু দিয়ে ঢেকে নামায আদায় করতে হবে। (আদ দুররুল মুখতার ১/৬৪৮)

এ সম্পর্কে হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করা হল,

عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي.

অর্থ : হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাযি. এর ঘরে একটি পর্দা টানানো ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার সামনে থেকে এটা সরাও। কারণ এর ছবিগুলো আমার নামাযে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৯৫৯)

বাচ্চাদের জন্য প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি খেলনার বিধান

ছবি তৈরি করা এবং আঁকা যদিও হারাম। কিন্তু বাচ্চাদের জন্য প্রাণীর আকৃতিতে যে খেলনা পুতুল তৈরি করা হয় তা বাচ্চাদের খেলার জন্য রাখা বৈধ কি না এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম থেকে একাধিক মত বর্ণিত আছে।

এক. এ ধরনের খেলনার হুকুম ছবির বিধানের ব্যতিক্রম। অর্থাৎ, এ ধরনের ছবি হারাম নয়। কাযী ইয়ায এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি এ মতটিকে জমহুর উলামায়ে কেরামের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা হাসকাফী ইমাম আবু ইউসুফের মত বর্ণনা করেছেন যে, বাচ্চাদের জন্য এর দ্বারা খেলাধূলা বৈধ। ইবনে বাত্তালও এ মত পোষণ করেছেন।

দুই. অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনদের মত হল, বাচ্চাদের জন্য প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি খেলনা দ্বারা এক সময় খেলার অনুমতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং তা অন্যান্য ছবির মতই হারাম। দাউদী, বায়হাকী, ইবনুল জাওযী সহ অনেকেই এ মতের প্রবক্তা।

তিন. কারো মতে প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি খেলনা কোন সময়ই জায়েয ছিল না। যে হাদীসে বাচ্চাদের পুতুল জাতীয় খেলনার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, এমন খেলনা যা বাস্তবে ছবির আকৃতি নয়। বরং বাচ্চারা খেলাচ্ছলে যে পুতুলের আকৃতি তৈরি করে এখানে তা উদ্দেশ্য। ইমাম মুনযিরী, ইমাম হালীমীসহ কারো কারো মত এটি। এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাগুলো হল,

عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى في وسطهن؟ قالت فرس قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان قال فرس له جناحان؟ قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى رأيت نواجذه.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুক বা খায়বর যুদ্ধ থেকে ফিরলেন। ঘরে ছোট তাকে একটি পর্দা লাগানো ছিল। বাতাসে পর্দার একপাশ সরে আয়েশা রাযি. এর (পুতুলের মত) খেলনাগুলো বেরিয়ে পড়ল। তিনি বললেন, আয়েশা! এগুলো কী? হযরত আয়েশা বললেন, আমার খেলনা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর মাঝে ডানা লাগানো একটি ঘোড়া দেখে বললেন, এগুলোর মাঝখানে এটা কী? আয়েশা রাযি. বললেন, ঘোড়া। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এর উপর আবার ওটা কী? আয়েশা বললেন, ডানা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঘোড়ার আবার ডানা হয় না কি! আয়েশা রাযি. বললেন, আপনি শোনেননি, সুলাইমান আ. এর ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল! নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন। (এবং এত হাসলেন যে, তার) মাড়ির দাঁতও প্রকাশ হয়ে গেল। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৪৯৩২, সুনানে বাইহাকী; হা.নং ২০৯৮২, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৪৭৬৪)

অপর বর্ণনায় এসেছে,

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলের নিকটে থাকাকালীন (পুতুলের মত) খেলনা দিয়ে খেলা করতাম। আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলতো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাশরীফ রাখতেন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (দৃষ্টির) আড়ালে চলে যেত। এরপর (নবীজী চলে গেলে) আবার আসত এবং আমার সাথে খেলা করতো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬১৩০, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৪৪০)

ইমাম আহমাদ বিন উমর কুরতুবী রহ. (মৃত ৬৫৬হি.) বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وفي فائدته، وأنه مستثنى من الصور الممنوعة؛ لأن ذلك من باب تدرب النساء من صغرهن على النظر لأنفسهن وبيوتهن، وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن غير مالك فإنَّه كره ذلك، وحمله بعض أصحابه على كراهية الاكتساب بذلك.

অর্থ : এই হাদীস থেকে বোঝা গেল, এ ধরনের খেলনা নিষিদ্ধ ছবির হুকুম বহির্ভূত। এর কারণ হল, এগুলো বাচ্চা মেয়েদের নিজের এবং ঘরের কাজকর্ম বিষয়ে অনুশীলনের জন্য। উলামায়ে কেরাম এ সবের বেচাকেনা জায়েয বলেছেন। তবে ইমাম মালেক রহ. মাকরূহ মনে করতেন। মালেকী মাযহাবের কেউ কেউ মালেক রহ. এর কথার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এর মাধ্যমে কামাই-রোজগারকে অপছন্দ করতেন। (অর্থাৎ,খেলতে নিষেধ নেই)। (আল মুফহিম ৬/৩২৩)

ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেন,

قال القاضي فيه جواز اللعب بهن ... وروي عن مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب بها وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن وقالت طائفة هو منسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي.

অর্থ : কাযী ইয়ায বলেন, এই বর্ণনা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, পুতুল দ্বারা খেলা করা জায়েয। ... ইমাম মালেক রহ. খেলনা পুতুল ক্রয় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে নাজায়েয মনে করতেন। মালেক রহ. এর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হল, তার দৃষ্টিতে পুতুল বিক্রি করে কামাই করা নাজায়েয এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের এমন কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য। কাযী ইয়ায বলেন, জুমহুর উলামায়ে কেরামের মাযহাবও তাই। উলামায়ে কেরামের এক জামাআত বলেন, ছবি হারাম হওয়ার মাধ্যমে এ ধরনের খেলনা দ্বারা খেলার বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। (শরহে মুসলিম ৮/১৫/১৮৮)

আল্লামা ইবনে হাজার উল্লেখ করেন,

واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن قال وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ واليه مال بن بطال وحكى عن بن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ... وقال المنذري إن كانت اللعب كالصورة فهو قبل التحريم وإلا فقد يسمى ما ليس بصورة لعبة وبهذا جزم الحليمي فقال إن كانت صورة كالوثن لم يجز وإلا جاز.

অর্থ : বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে খেলনা পুতুলকে ছবি রাখার নিষিদ্ধতার ব্যাপকতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। কাযী ইয়ায (হাদীসের এ ব্যাখ্যাকে) সঠিক মনে করেন এবং জমহুর উলামা থেকে এ কথা নকল করেছেন যে, বাচ্চাদের ঘরোয়া কাজের অনুশীলন উদ্দেশ্য হলে তারা এ ধরনের খেলনা বিক্রিকেও জায়েয বলেছেন। কাযী ইয়ায বলেন, কোন কোন উলামায়ে কেরাম বলেছেন, ছবি নিষিদ্ধের হাদীস দ্বারা এ ধরনের খেলনা তৈরির বৈধতাও রহিত হয়ে গেছে।

(আল্লামা ইবনে হাজার বলেন,) ইবনে বাত্তালের মতামত কাযী ইয়াযের দিকে ধাবিত। ইবনে আবী যায়েদ ইমাম মালেক রহ. থেকে বর্ণনা করেন , তিনি কোন ব্যক্তির তার কন্যার জন্য (ছবি জাতীয়) খেলনা ক্রয় করা মাকরূহ মনে করতেন। এর ভিত্তিতে দাউদী রহিত হওয়ার মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন...

ইমাম বাইহাকী রহ. এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনার পর বলেন, এর দ্বারা ছবি রাখা নিষেধ হওয়া প্রমাণিত। সুতরাং হযরত আয়েশা রাযি. এর ক্ষেত্রে এ সবের ছাড় হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটিত বলে ধরা হবে। ইবনুল জাওযী এ মতটিকে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত মত মনে করেছেন।

ইমাম মুনযিরী বলেন, যদি (হাদীসে উল্লিখিত) খেলনা দ্বারা ছবি আকৃতির খেলনা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে (এর ব্যাখ্যা হল,) এ ঘটনা হারাম হওয়ার পূর্বের। আর যদি ছবি আকৃতির খেলনা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে (এ হাদীসের ব্যাখ্যা হল,) যে খেলনা ছবির আকৃতির নয় তাকে لعبة বলা হয়েছে।

আল্লামা হালীমী এ মতটি সঠিক মনে করেন। তিনি বলেন, যদি খেলনার আকৃতি মূর্তির আকৃতির হয় তাহলে তা জায়েয নেই, অন্যথায় জায়েয। (ফাতহুল বারী ১০/৬৪৬, উমদাতুল কারী ১৫/২৬৪, শরহুত ত্বীবী ৮/২৯৪, ফাতহুল ওয়াদূদ ৪/৫৭৩)

আল্লামা ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ কিরমানী (মৃত ৭৮৬হি.) বলেন,

قال ابن بطال: المقصود من الحديث الرخصة لى التماثيل واللعب التى يلعب بها الجوارى.

ইমাম বায়হাকী রহ. (মৃত ৪৫৮হি.) বলেন,

في الحديث من غزوة تبوك أو خيبر وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم النهي عن التصاوير والتماثيل من أوجه كثيرة عنه فيحتمل أن يكون المحفوظ في رواية أبي سلمة عن عائشة قدومه من غزوة خيبر وأن ذلك كان قبل تحريم الصور والتماثيل ثم كان تحريمها بعد ذلك.

অর্থ : (আয়েশা রাযি. এর খেলনা সম্পর্কে সুনানে আবু দাউদে যে বর্ণনাটি এসেছে) সেই বর্ণনায় আয়েশা রাযি. এর ঘটনাটি তাবুক যুদ্ধের পরে হয়েছিল না খায়বার যুদ্ধের পরে? এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাকারী সংশয় প্রকাশ করেছে। অপর দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অসংখ্য সূত্রে মূর্তি এবং ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। সে হিসেবে বলা যায় যে, (আবু দাউদের হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি) গাযওয়ায়ে খায়বার থেকে ফেরার পর হয়েছে। এ মতটিই সংরক্ষিত এবং সঠিক। সুতরাং পুতুল দ্বারা খেলার ঘটনাটি ছবি এবং মূর্তি হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা। এরপর সব ধরনের ছবি হারাম হয়ে গেছে। (আস-সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকী ১০/৩৭১)

আল্লামা হাসকাফী নকল করেন,

وفي آخر حظر المجتبى عن أبي يوسف: يجوز بيع اللعبة وأن يلعب بها الصبيان.

অর্থ : হযরত আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত, বাচ্চাদের ছবি আকৃতির খেলনা বিক্রি করা জায়েয এবং তা দ্বারা বাচ্চারা খেলতেও পারে। (আদদুররুল মুখতার ৫/২২৬)

মালেকী মাযহাবের *মানহুল জালীল শরহে মুখতাসারুল খলীল* (৩/৫২৯)-এ বলা হয়েছে,

واستثني من المحرم لعبة بهيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز تصويرها وبيعها وشراؤها لتدريبهن على تربية الأولاد.

খেলনা পুতুলের ব্যাপারে অধিক গ্রহণযোগ্য মত

বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম যা কিছু বলেছেন তার মধ্যে আমাদের দৃষ্টিতে এ ব্যাখ্যা সঠিক মনে হয় যে, আয়েশা রাযি. যে পুতুলের কথা বলেছেন, তা দ্বারা হুবহু প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি পুতুল উদ্দেশ্য নয় (বিশেষত বর্তমান বাজারে যে খেলনা পুতুল পাওয়া যায় তা তো অবশ্যই নয়)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন খেলনা পুতুল যা বাচ্চারা নিজেরা তৈরি করে, সেটাকে কাপড় পরায় এবং 'বাবু' মনে করে খেলাধূলা করে।

আল্লামা কুরতুবী রহ. পূর্বে বর্ণিত সহীহ বুখারী শরীফের হাদীসের শব্দ كنت العب بالبنات এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وهن اللعب جمع لُعْبة وهو ما يُلْعَبُ به والبنات جمع بنت وهنَّ الجواري وأضيفت اللّعب للبنات لأنهنَّ هنَّ اللواتي يصنعنها ويلعبن بها.

অর্থ : لعبة বলা হয় যার দ্বারা খেলা হয়। খেলনা পুতুলকে بنات বলার কারণ হল, বাচ্চা মেয়েরা নিজ হাতে এ ধরনের খেলনা পুতুল তৈরি করত তাই بنات (কন্যা) এর দিকে لعب সম্বন্ধযুক্ত করে খেলনা পুতুলের নাম لعب البنات রাখা হয়েছে। (আলমুফহিম; হা.নং ৩২৩)

হযরত আয়েশা রাযি. এর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এ কথার উল্লেখ নেই যে, সেই খেলনাগুলো ছবি আকৃতির ছিল। আরবদেশে বাচ্চাদের খেলনা কেমন হয় তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শাইখ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ তায়ীজারী বলেন,

بل والظاهر والله أعلم أنها كانت على نحو لعب بنات العرب في زماننا فإنهن يأخذن عودًا أو قصبة أو خرقة ملفوفة أو نحو ذلك فيضعن قريبًا من أعلاه عودا معترضًا ثم يلبسنه ثيابًا ويضعن على أعلاه نحو خمار المرأة وربما جعلته على هيئة الصبي في المهد ثم يلعبن بهذه اللعب ويسمينهن بنات لهن على وفق ما هو مروي عن عائشة وصواحباتها رضي الله عنهن.

وقد رأينا البنات يتوارثن اللعب بهذه اللعب اللاتي وصفنا زمانا بعد زمان ولا يبعد أن يكون هذا التوارث قديمًا ومستمرًا في بنات العرب من زمن الجاهلية إلى زماننا هذا والله أعلم.

অর্থ : বাস্তবতা তো আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। তবে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, এই খেলনা দ্বারা আমাদের বর্তমান সময়ের মেয়েদের খেলনার মত খেলনা উদ্দেশ্য। বর্তমানের মেয়ে শিশুরা প্রথমে একটি (লম্বা) চটি, একটি (ছোট) কাঠি, গোল করে মোড়ানো একটি কাপড়ের পুটলি ও কিছু টুকরো কাপড় বা এ জাতীয় জিনিস সংগ্রহ করে। তারপর লম্বা চটিটির উপরের অংশের কাছাকাছি কাঠিটি আড়াআড়ি বাঁধে। এরপর এটার গায়ে কাপড় জড়িয়ে লম্বা চটির একেবারে মাথায় কাপড়ের পুটলিটি বেঁধে মেয়েদের ওড়না পরার মত আঁচল পড়িয়ে দেয়। আবার কখনো দেখা যায়, দোলনায় বাচ্চার মত কিছু একটা বনিয়ে সেটা দিয়ে খেলা করে। তো এই জিনিসটিকে তারা بنات(কন্যা) মনে করে খেলে, ঠিক যেমনটা আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত। আমরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের দেখেছি যে, পূর্বে যে ধরনের খেলনার কথা বললাম তা যুগ যুগ ধরে পরম্পরায় চলে আসছে। এ কথা বললে বাড়াবাড়ি হবে না যে, এই পরম্পরার ব্যাপারটি আরবকন্যাদের মাঝে ইসলামের শুরু যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

এরপর তিনি একটি বিষয় পরিষ্কার করেছেন যে, আরবের অনেক শিশু প্রাণীর আকৃতির পুতুল দ্বারা খেলে। তাহলে পূর্বোক্ত বক্তব্যের কী বাস্তবতা রইল? এর জবাবে তিনি বলেন,

وأما السالمات من أدناس المدنية الإفرنجية ومن مخالطة نساء الأعاجم وأشباه الأعاجم فهؤلاء لم يزلن على طريقة بنات العرب. ولعبهن على ما وصفنا من قبل.

অর্থ : যারা ইউরোপিয়ান কালচারের কলুষমুক্ত এবং অনারবীয়দের সংশ্রব ও সাদৃশ্যমুক্ত তারা পুতুল খেলায় (প্রকৃত) আরব কন্যাদের মত। আর তাদের পুতুল খেলনা কেমন তার বিবরণ আমি আগেই দিয়েছি। (ই'লানুন নাকীর আলাল মাফতূনীন বিততাসবীর ১/৬৭)

উল্লেখ্য, শাইখ বিন বায এবং শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফিফী উক্ত গ্রন্থের উপর প্রশংসাপত্র লিখেছেন।

আল্লামা কাশ্মীরী রহ. বলেন,

أن البنات جائزة، وكانت حقيقتها في القديم أنهم كانوا يأخذون ثوبا، ويشدونه في الوسط، فكانت لا تحي عن صورة وشكل، ولم تكن كبناتنا اليوم، فإنها تماثيل كالأصنام، فلا تجوز قطعا.

অর্থ : খেলনা পুতুল জায়েয। অতীতে এগুলো দ্বারা খেলার ধরন এই ছিল যে, তারা কাপড় সংগ্রহ করে এর মাঝখানে গিঠ দিতো। এ ধরনের খেলনা পুতুল (ছবির) আকার-আকৃতি বুঝায় না এবং তা আজকালের খেলনা পুতুলের মতও ছিল না। বর্তমানের খেলনা পুতুল তো প্রতিমা-মূর্তির মত। নিশ্চিতভাবে তা জায়েয নেই। (ফয়যুল বারী ৭/৩৮৮)

সম্ভবত সহীহ বুখারীর এ হাদীসটি শেষোক্ত বক্তব্যের সমর্থন করে। হযরত রবী বিনতে মুআওয়ায থেকে বর্ণিত,

... ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.

অর্থ : ... আমাদের ছোট বাচ্চারা রোযা রাখতো। আমরা তাদের জন্য তুলার টুকরা দিয়ে খেলনা বানাতাম। তাদের কেউ যখন খাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করতো, আমরা এই ধরনের পুতুল দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতাম। ইফতার পর্যন্ত এভাবে কেটে যেতো। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৬০)

আর আবু দাউদের হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক খেলনার ডানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা প্রমাণ করে যে, এটা প্রকৃত অর্থে ছবি ছিল না। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন, ওটা কি জিনিস? এটা বলেননি, ডানা কোত্থেকে এলো?

সারকথা

বাচ্চাদের খেলনা হিসেবে তৈরি প্রচলিত খেলনা পুতুল রাখা হারাম। কারণ,

১. যে সকল হাদীসে খেলনা পুতুলের কথা বলা হয়েছে সেগুলোতে প্রাণীর আকৃতির কথা স্পষ্ট বুঝে আসে না। অথচ হারাম হওয়ার পক্ষের হাদীসগুলো স্পষ্ট।

২. আরবে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী ঐতিহ্যবাহী পরিবারের বাচ্চাদের জন্য যে খেলনা পুতুলের প্রচলন আছে তা বাস্তবে প্রাণীর আকৃতির নয়; বরং তা বাচ্চাদের কাল্পনিক পুতুল হয়ে থাকে।

এ কথা ঠিক যে, এ সংক্রান্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের মতবিরোধ থাকায় এর নিষিদ্ধতা অন্যান্য ছবির তুলনায় হালকা হবে।

কার্টুনের শরয়ী বিধান

বর্তমানে ভিডিও কার্টুনের খুব প্রচলন। বাচ্চারা এ ধরনের কার্টুন খুব পছন্দ করে। এ ধরনের কার্টুনের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

এক. এ ধরনের কার্টুন হারাম। কারণ কার্টুনের আকৃতি যদি হাতে আঁকা হয় তবে তাকে সকলে ছবি আঁকাই বলবে। সুতরাং ভিডিও কার্টুনের বিধানও তাই হবে।

দুই. যে কার্টুন কাল্পনিক হয় তা জায়েয। যেমন গাড়ীর মধ্যে চোখ কান লাগিয়ে আকৃতি দেয়া কার্টুন ইত্যাদি। এসব জায়েয। কারণ আল্লাহর সৃষ্টি এমন নয়, তাই সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয় না।

তিন. ভিডিও কার্টুন মুবাহ। এ মতের প্রবক্তারা বলেন, যে ছবিতে অপদস্ত অবস্থা বুঝা যায় তা ছবির নিষিদ্ধতা বহির্ভূত। আর কার্টুনও এমন। কার্টুনের শাব্দিক অর্থই হল ব্যঙ্গ করা। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,

أما صور الكرتون التي ذكرتم أنها تخرج في التلفزيون فإن كانت على شكل آدمي فحكم النظر فيها محل تردد، هل يلحق بالصور الحقيقية أو لا؟ والأقرب أنه لا يلحق بها.

সৌদি আরবের ইফতা বোর্ডের ফতওয়া এখানে তুলে ধরা হল-

س : ما حكم مشاهدة وشراء افلام الكارتون الاسلامية؟

ج : لا يجوز بيع ولا شراء واستعمال افلام الكرتون، لما تشتمل عليه من الصورة المحرمة...

কার্টুনের ফিল্ম বেচাকেনা এবং রাখা জায়েয নেই। কারণ এ ধরনের ফিল্ম হারাম ছবি সম্বলিত হয়ে থাকে। (ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম- ৪৩৪)

প্রাণীর আকৃতিতে খাদ্যদ্রব্য তৈরির হুকুম

যে সকল আকৃতি স্বাভাবিক প্রচলনে সংরক্ষণ ও রেখে দেয়া উদ্দেশ্য হয় না এমন আকৃতির ব্যাপারে শরীয়তে দুই ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, নাজায়েয হওয়াটা বেশি যুক্তিযুক্ত। তিনি বলেন,

وفيما لا يبقى من الصور كصور الفخار، ففي كل ذلك منهما قولان ... غير أن المشهور فيما لا يبقى المنع.

অর্থ : যে ছবি বাকী থাকে না যেমন মৃৎকর্মকারের তৈরি আকৃতি। এ ধরনের ছবির ব্যাপারে দুই ধরনের মত পাওয়া যায়। ... তবে এ ধরনের ছবির ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মত নিষেধ হওয়ার মতটিই। (আল-মুতকিন ৫/৪২৬)

আল্লামা ইবনে হাজার রহ. বর্ণিত মত উল্লেখ করার পর বলেন,

وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار أوبلعب البنات محل تأمل.

অর্থ : প্রাণীর আকৃতিতে যে মিষ্টি দ্রব্য তৈরি করা হয় তা মৃৎকর্মকারের তৈরি আকৃতির মত হারাম হবে নাকি لعب البنات তথা বাচ্চাদের খেলনার মত বৈধ হবে? বিষয়টি আরো চিন্তা গবেষণার দাবী রাখে। (ফাতহুল বারী ১০/৪৭৫)

ইবনে হাজার রহ. যদিও খাবার প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি করলে হারাম হবে কি না এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর থেকে বেঁচে থাকা যে অধিক সতর্কতা এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ আল্লামা কুরতুবীর মূলনীতির আলোকে তা হারামই সাব্যস্ত হয়।

মালেকী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ *আশ শরহুস সগীর* (২/৫০১) বলা হয়েছে,

وفيما لا يطول استمراره خلاف والصحيح حرمته.

মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরির বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে মূর্তি ও ভাস্কর্য দুটিই তৈরি করা হারাম। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি করা হারাম, চাই তাতে পূজার উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক। এক্ষেত্রে প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়াই হারাম হওয়ার কারণ। আর যদি সেই প্রতিকৃতি পূজার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়ে থাকে আর তা কোন মুসলমান করে তাহলে তো কুফরী পর্যন্ত পৌঁছার আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.

অর্থ : তোমরা পরিহার করো অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মূর্তিসমূহ এবং পরিহার কর মিথ্যাকথন। (সূরা হজ্জ- ৩০)

আবুল হাইয়ায আসাদী রহ. বলেন, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব আমাকে বললেন,

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

অর্থ : আমি কি তোমাকে এমন কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করবো না, যে

কাজের জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? (তা এই যে,) তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধিসৌধ ভূমিস্যাৎ করে দিবে। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৯৬৯)

আলী ইবনে আবী তালেব বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন,

ايكم ينطلق الى المدينة فلا يدع بها وثنا الا كسره ولا قبرا الا سواه ولا صورة الا لطخها.

তোমাদের মধ্যে কে আছে যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোন মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোন সমাধিসৌধ পাবে তা ভূমিস্যাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোন চিত্র পাবে তা মুছে দিবে? অতঃপর আলী রাযি. এই দায়িত্ব পালন করলেন। ফিরে আসার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

من عاد لصنعة شيئ من هذا فقد كفر بما انزل علي محمد.

যে কেউ পুনরায় ঐসব বস্তু তৈরি করবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি নাযিলকৃত দীনকে অস্বীকারকারী। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৬৫৭)

উমর রাযি. যখন শামে গেলেন তখন খ্রিস্টানদের কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তাকে তাদের গীর্জায় নিমন্ত্রণ করলেন। হযরত উমর রাযি. এ কথা বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন যে,

انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها يعني التماثيل.

তোমাদের গির্জাগুলোতে বিভিন্ন মূর্তি রয়েছে। এজন্য আমরা তাতে প্রবেশ করব না। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক; হা.নং ১৯৪৮৬)

এছাড়া মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরি করার দ্বারা প্রাণীর আকৃতি তৈরি করা হয় বলে তা ছবির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে এসেছে।

স্কাইপির ভিডিও কল এবং সরাসরি সম্প্রচারিত ছবির বিধান

আমরা পূর্বেই বলেছি ছবি বলা হয় যা মূলের অনুগামী হয় না, বরং মূলের অনুপস্থিতিতেই তা সংরক্ষিত এবং স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। সুতরাং যদি অন্য কোন শরয়ী নিষিদ্ধতা না থাকে তবে ভিডিও কল করা জায়েয। কারণ এ ক্ষেত্রে যে ছবি ভেসে আসে তা মূলের অনুগামী। অপর প্রান্ত থেকে যদি (যার ছবি) সে সটকে পড়ে তাহলে ছবি দৃষ্টিতে আসবে না। একই বিধান 'লাইভ শো' অর্থাৎ, সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে শরীয়তে নিষিদ্ধ অন্য কোন কিছু এতে অন্তর্ভুক্ত হলে তা দেখা বা রাখা সেই নিষিদ্ধতার কারণে নাজায়েয হবে।

ছবি দেখার ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে

ছবি দেখা বিভিন্ন কারণে হারাম হতে পারে। যেমন কেউ কোন অপরিচিত সুন্দরীর ছবি দেখলো, এতে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কল্পনা জল্পনা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং খারাপ পরিণতির দিকে ধাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। তাই ছবি দেখা হারাম। শরীয়তের একটি নীতি হল,

المفضي إلى الحرام حرام.

আরো নানাবিধ কারণে ছবি দেখা হারাম হতে পারে। কিন্তু এই শিরোনামের আলোচ্য বিষয় হল, 'ছবি' ছবি বলেই দেখা হারাম হবে কি না?

এক. *আশশরহুস সগীর* (২/৫০১) গ্রন্থে ছবি দেখার হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

النظر الى الحرام حرام.

অর্থ : হারামের প্রতি দৃষ্টি দেয়াও হারাম। সুতরাং ছবি দেখা হারাম।

মুফতী শফী রহ. *তাসবীর কে শরয়ী আহকাম* (পৃষ্ঠা ৮৯)-এ বলেন,

جن تصاویر کا بنانا اور گھر میں رکھنا ناجائز ہے ان کا ارادہ اور قصد کے ساتھ دیکھنا بھی ناجائز ہے، البتہ تبعا بلا قصد نظر پڑ جائے تو مضائقہ نہیں، جیسے کوئی اخبار یا کتاب مصور ہے مقصود اسکا مضمون دیکھنا ہے، بلا ارادہ تصویر بھی سامنے آجاتی ہے، اس کا مضائقہ نہیں۔

অর্থ : যে ছবি তৈরি করা এবং ঘরে রাখা নাজায়েয সেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে দেখাও নাজায়েয। তবে অনিচ্ছায় অন্য কিছুর অনুগমে দৃষ্টি পড়ে গেলে কোন গুনাহ নেই। যেমন ছবিবিশিষ্ট কোন বই বা পত্রিকার আলোচ্য পাঠ দেখতে গিয়ে ছবির প্রতিও দৃষ্টি পড়ে গেল এতে অসুবিধা নেই।

উক্ত বক্তব্য থেকে এ কথাই বুঝে আসে যে, ছবি যদি নাজায়েয পর্যায়ের হয় তাহলে ছবি হওয়ার কারণেই তা দেখা হারাম। মুফতী শফী রহ. এক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের সেই প্রসিদ্ধ মূলনীতি النظر الى الحرام حرام কে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুফতী শফী রহ. এর উক্ত মতের কারণেই হয়তোবা আমাদের অঞ্চলে মাসআলাটি হারাম হিসেবে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

দুই. মালেকী মাযহাবে ছবি দেখা হারাম হওয়ার সুস্পষ্ট বক্তব্য মিলে। আমরা যতদূর যাচাইয়ের প্রয়াস পেয়েছি তাতে মালেকী মাযহাব ব্যতীত অন্য কোন মাযহাবে 'ছবি' ছবি হওয়ার কারণে দেখা হারাম এমন কোন স্পষ্ট কথা খুঁজে পাইনি।

শাফিয়ী মাযহাবের ব্যাপারে *আল-মউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ* (১২/১২৩) -এ উল্লেখ করা হয়েছে,

قال الشّيخ الباجوريّ يجوز التّفرّج على صور حيوان غير مرفوعة أوعلى هيئة لا تعيش معها كأن كانت مقطوعة الرّأس أوالوسط أو مخرّقة البطون.

অর্থ : শাইখ বাজুরী রহ. বলেন, দেয়ালে সাটানো নয় এমন প্রাণীর ছবি দেখা অথবা এমন অঙ্গবিহীন ছবি যে অঙ্গ ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না যেমন মুণ্ডুবিহীন, পেট ফাঁড়া ছবি এসব দেখা জায়েয।

এ বক্তব্যের কাছাকাছি আরেকটি বক্তব্য পাওয়া যায় নূরুদ্দীন আলী ইবনে আলী সংকলিত *নিহায়াতুল মুহতাজ* এর টিকায় (২/৫৭১) তিনি বলেন,

التفرج على الزينة المحرمة لكونها بنحو الحرير حرام.

অর্থ : হারাম পদ্ধতিতে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয় যেমন রেশমের কাপড়ের মাধ্যমে সৌন্দর্য গ্রহণ; এমন সৌন্দর্য দেখাও হারাম।

শাফিয়ী মাযহাবের প্রাচীন ফিকহী গ্রন্থ থেকেও 'হারাম ছবি' ছবি হওয়ার কারণে দেখা হারাম এ কথা বুঝা যায় না। ইমাম শাফিয়ী রহ. বলেন,

إن رأى صورا في الموضع الذى يدعى فيه ذوات أرواح لم يدخل المنزل الذى تلك الصور فيه إن كانت تلك منصوبة لا توطأ فإن كانت توطأ فلا بأس أن يدخله.

অর্থ : আহুত স্থানে যদি প্রাণীর ছবি থাকে এবং তা সেখানে টানানো থাকে তাহলে সে স্থানে প্রবেশ করবে না। আর যদি ছবিটা সেখানে মাড়ানো অবস্থায় হয় তবে প্রবেশ করতে কোন শরয়ী বাধা নেই। (কিতাবুল উম্ম ৭/৪৫২)

এছাড়া আবুল হাসান মাওয়ারদী (৪৫০হি.) *আল হাবীল আল কাবীর* (১২/১৪৫)-এ ইমাম গাযালী রহ. (৫০৫হি.) *আলওয়াসিত ফিল মাযহাব* (৫/২৭৭)-এ একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

এসব বক্তব্য থেকে এ কথা বুঝে আসে যে, যে সূরতে ছবির প্রতি কোনোভাবে সম্মান বুঝে আসে সেক্ষেত্রে ছবিবিশিষ্ট ঘরে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু যখন ছবির প্রতি সম্মানবোধ বুঝে আসে না তখন ছবিবিশিষ্ট ঘরে প্রবেশ নিষেধ নয় এবং

এমন ছবি দেখাও নিষেধ নয়। কারণ দ্বিতীয় সূরতে ইচ্ছাকৃতভাবে ছবিবিশিষ্ট ঘরে প্রবেশের মাধ্যমে সে ইচ্ছা করেই ছবি দেখলো, এই কাজ তো ইমাম শাফিয়ী রহ. এর বক্তব্য অনুযায়ী নিষেধ হল না। অথচ অপদস্ত ছবি তৈরি করা হারাম তাই ছবি হওয়ার কারণে দেখা হারাম হলে এমন ছবি দেখাও হারাম হতো। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, শাফিয়ী মাযহাবে মূলত হারাম ছবি ছবি হওয়ার কারণে দেখা হারাম নয়; বরং তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন প্রকাশ পেলেই কেবল হারাম হয়।

হাম্বলী মাযহাবে ছবি দেখা নাজায়েয নয়। ইমাম ইবনে কুদামা (৬২০হি.) বলেন,

ولا يجب على من رآه في منزل الداعي الخروج في ظاهر كلام أحمد.

অর্থ : দাওয়াত দাতার ঘরে ছবি দেখলে দর্শনকারীর জন্য সেখান থেকে বের হওয়া আবশ্যক নয়। (আলমুগনী ১০/২০২)

হানাফীদের ব্যাপারে আল্লামা শামী রহ. বলেন,

هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوشة محل تردد و لم أره.

অর্থ : অঙ্কিত ছবির প্রতি কামভাব নিয়ে দৃষ্টি দেয়া হারাম কি না এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত আমাদের জানা নেই। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৭৩)

এখানে যে ছবিতে কামভাব হয় সে ছবির হুকুমের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তাহলে কামভাব সৃষ্টি হয় না এমন ছবির বিষয়ে ছবি হওয়ার কারণে দেখতে নিষেধ হওয়া বুঝা যায় না। কারণ কামভাবের কারণে হারাম হবে কি না এটা তখনই গবেষণার বিষয় হতে পারে যখন স্বয়ং দেখা জায়েয হবে।

তিন. ছবি দেখা সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস এখানে উল্লেখ করা হল,

عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشف عن وجهك الثوب فإذا هي أنت.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, একজন ফেরেশতা রেশমের কাপড়ে পেঁচিয়ে (তোমার আকৃতি) নিয়ে এসেছে। তিনি বললেন, ইনি আপনার স্ত্রী। অতঃপর তোমার চেহারা থেকে কাপড় সরানো হল, দেখি তুমিই সে! (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫১২৫)

ইবনে হাজার রহ. *ফাতহুল বারী*তে আরেকটা সূত্রে বর্ণনা করেন,

لقد نزل جبريل بصورتي في راحته.

অর্থ : জিবরাঈল আ. তার তালুতে আমার ছবি নিয়ে এলেন।

أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت قال فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام.

অর্থ : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে ইবরাহীম আ. এবং ইসমাঈল আ. এর ছবি দেখলেন যে, তারা সর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করছে। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২০২৭)

ان النصارى صنعوا عمر رض حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال: اين هو؟ قالوا: فى الكنيسة، فابى ان يذهب. وقال لعلى: امض بالناس، فليتغدوا، فذهب علي رض بالناس، فدخل الكنيسة، وتغدى هو والمسلمون وجعل على ينظر الى الصور.

অর্থ : হযরত উমর রাযি. যখন শামে গেলেন খ্রিস্টানরা তাঁর সম্মানে খাবারের আয়োজন করে দাওয়াত করল। তিনি বললেন, দাওয়াত খেতে কোথায় যেতে হবে? তারা বললো, আমাদের গির্জায়। উমর রাযি. এ কথা শুনে সেখানে যেতে অস্বিকৃতী জানালেন এবং আলী রাযি. কে বললেন, আপনি লোকদের নিয়ে গিয়ে খাবার খেয়ে আসেন। সুতরাং আলী রাযি. লোকদেরকে সাথে নিয়ে গির্জায় দাওয়াত খেলেন। আলী রাযি. সেখানে গিয়ে ছবিগুলো দেখছিলেন। (আলমুগনী ১০/২০৩)

আলোচনার সারসংক্ষেপ

১. ছবি দেখার ক্ষেত্রে যদি বিশেষ কারণে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা থাকে যেমন, গাইরে মাহরামের ছবি বা অশ্লিল নির্লজ্জ ছবি হয় কিংবা ছবির অবস্থান দৃষ্টে অনুরাগ বা সম্মানবোধ বুঝে আসে তাহলে ছবি দেখা নাজায়েয। শরীয়তের মূলনীতি হল,

المفضي إلى الحرام حرام.

২. মালেকী মাযহাবে হারাম ছবি দেখা ছবি হওয়ার কারণে হারাম।

৩. অন্যান্য মাযহাবে ছবি শুধু এ কারণে দেখা হারাম হবে না যে, এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ ছবি। ফিকহী পাঠ, হাদীসসমূহ এ মতকে সমর্থন করে।

উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আরো চিন্তা গবেষণার অবকাশ রয়েছে। সুতরাং উলামায়ে কেরাম সমীপে এ বিষয়ে আরো চিন্তা গবেষণার অনুরোধ রইল। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোন জিনিস হারাম হলে তা দেখা হারাম হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নয়। যে হারামটা দেখার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটা তো দেখা হারাম হতে পারে, যেমন সতর দেখা হারাম। তাই বলে কি শুকর খাওয়া, রেশমী কাপড় পরিধান করা হারাম বলে দেখাও কি হারাম হয়ে যাচ্ছে!?

উলামায়ে কেরামের ভিডিও বয়ান

বর্তমানে অনেক উলামায়ে কেরাম তাদের বয়ান ভিডিও করে ইন্টারনেটে লোড করছেন। জনসাধারণের কেউ কেউ এ বিষয়টি নিয়ে খুব পেরেশান থাকে। আমাদের কাছে এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে যে, ডিজিটাল ছবি যদি হারাম হয়ে থাকে তাহলে আলেমগণ তাদের বয়ান ভিডিও করছেন কেন?

এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা তো উলামায়ে কেরামেরই কাজ। সাধারণ জনগণের এ ব্যাপারে খুব বেশি ভাবার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া একজন বিজ্ঞ আলেম কখনো এ কাজ বিশেষ অপারগতার কারণেও করতে পারেন। যে কারণটি সর্বসাধরণের বোধগম্যের বাইরে। এর উপর ভিত্তি করে সাধারণের জন্য অযথাই ছবি তোলা কিংবা ছবি সংরক্ষণ কোনটিই বৈধ হয়ে যাবে না।

নিরাপত্তার জন্য সার্কিট ক্যামেরা ব্যবহার করা কিংবা পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা জায়েয বলে যেমন এনালগ ছবি এবং ডিজিটাল ছবি জায়েয হয়ে যায় না তদ্রূপ বিশেষ কোন ফেরকার প্রতিরোধ কল্পে কিংবা শরয়ী জরুরত পর্যায়ের কোন কারণে বয়ান ভিডিও করলে ছবি জায়েয হয়ে যায় না। সমাজের শাহরগে যাদের হাত এমন আলেমগণ কখনো বিশেষ কারণে কোন আলেমকে বয়ান ভিডিও করার হুকুম করেন এটাকে দলীল বানিয়ে সাধারণ জনগণের সুযোগ গ্রহণের অবকাশ নেই। এতে তারা হারাম কাজের গুনাহে গুনাহগার হবে।

এ কথা সত্য যে, নামধারী কিছু আলেমও শরয়ী প্রয়োজন ছাড়াই তাদের বয়ান ভিডিও করছে। এর থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন, আমীন।

প্রয়োজনে ছবি তোলা

কখনো কখনো অপারগতার কারণে মানুষ ছবি তুলতে বাধ্য হয়। কেউ যদি বাস্তবেই অপারগ হয় তাহলে ইসলামী শরীয়ত তার জন্য ছবি তুলতে ছাড় দিয়েছে। এক্ষেত্রে জনসাধারণের জন্য আবশ্যক হল কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে অপারগতার বিষয়টি উল্লেখ করে জেনে নিবে, শরীয়তে এক্ষেত্রে ছাড় রয়েছে কি না?

والله اعلم وعلمه اتم وأحكم.

লেখক : শিক্ষার্থী, ইফতা বিভাগ (৩য় বর্ষ), জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর

পা নি ন য় ! ম রী চি কা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... ***অর্থ :*** *এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)*

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-৭

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা। ইশার সময় মসজিদে গেলাম নামায পড়তে। নামাযের আগে খাদেম সাহেব আমাকে জানালেন, এক ভদ্র মহিলা মাগরিবের পর একটা বাচ্চা সাথে নিয়ে দীর্ঘ সময় আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। মাদরাসা থেকে আমার ফিরতে বিলম্ব দেখে অবশেষে খাদেম সাহেবের কাছ থেকে আমার মোবাইল নাম্বার নিয়ে গেছেন ফোনে কথা বলবেন বলে। আমি বললাম, আপনি তাকে বলতে পারতেন কোন পুরুষের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে। খাদেম সাহেব বললেন, আমি বলেছিলাম, কিন্তু ভদ্র মহিলা জানালো যে, ফিলহাল যোগাযোগ করার মত কোন পুরুষ তাদের নেই। আমি কিছুটা বিব্রতবোধ করতে লাগলাম এবং মনে মনে তার ফোন না করার আশা করতে লাগলাম। কিন্তু সে আশা পূরণ হলো না। নামায শেষে বাসায় গিয়ে মোবাইল খোলার পরপরই রিংটোন বেজে উঠলো। ফোন ধরলাম, তো অপর প্রান্ত থেকে মেয়েলি কণ্ঠে সালামের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম সেই অপ্রত্যাশিত ফোন। খুব বিনীত কণ্ঠে বললেন, হুযুর আমাদের বাসায় একটু আসবেন? আমি কারণ জানতে চাইলে বললেন, আমার নাতীটা কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করছে। ওকে একটু ঝাড়-ফুক করে দিবেন। বললাম, ঝাড়-ফুকের কাজে তো আমি অভিজ্ঞ নই। আপনি অভিজ্ঞ কারো খোঁজ নিন। তথাপি অনুরোধ করে বললেন, আপনার দ্বারা যতটুকু সম্ভব তাই করে দিনে, পরে প্রয়োজনে আমরা অভিজ্ঞ কারো কাছে যাবো। বললাম, আগামীকাল সকালে কোন পুরুষের সাথে আপনার নাতীকে পাঠিয়ে দিবেন। আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবো ইনশাআল্লাহ। তিনি বললেন, কোন পুরুষ থাকলে তো আর আপনাকে বাসায় আসার কষ্ট দিতে চেষ্টা করতাম না। বললাম, কেন বাবা নেই? বললেন, বাচ্চার বাবা আছে, কিন্তু সে তো আমার মেয়েকে ছেড়ে চলে গেছে। এজন্য দয়া করে আপনাকেই একটু আসতে হবে। আমি যে কেন পাশ কাটাতে চাচ্ছি মহিলা সেটা বুঝতেই চাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সম্মতি দিয়ে কথা শেষ করলাম। চিন্তা করছি, ঝাড়-ফুকের বিদ্যা বর্তমানে সর্বাপেক্ষা সহজ ও লাভজনক। এতদসত্ত্বেও মেয়েলি প্রসঙ্গের কথা ভেবেই আমরা এর থেকে দূরে থাকি। আর আজ সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে বাধ্য হচ্ছি। ওয়াদা রক্ষা না করলে মহিলা বারবার ফোনে বিরক্ত করবে, কিংবা যার তার কাছে অভিযোগ করে বেড়াবে।

শুধু মহিলা এমন বাসায় একা যাওয়া তো মোটেও ঠিক হবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম, ইদরীস ভাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। তিনি মুরুব্বী মানুষ, আর বললে যাবেনও। পরদিন ফজর নামায পড়ে মসজিদেই ইশরাকের অপেক্ষা করলাম। আর ইদরীস ভাইকেও বিষয়টা জানিয়ে সঙ্গে যেতে বললাম। তিনি রাজি হলেন। ইশরাক পড়ে দু'জনে সে বাসায় গেলাম। মেক্সি পরা বৃদ্ধা মহিলা বড় ওড়না জড়িয়ে এসে দরজা খুলে ড্রইং রুমে আমাদেরকে বসতে দিলেন। এরপর বলতে শুরু করলেন নাতীর অসুবিধার কথা।

বয়স প্রায় আট বছর। আজব ধরনের অসুবিধা। সারাদিন বাথরুমে থাকতে চায়। বাথরুম খালি দেখলে ঢুকে কমোডে বসে থাকে। ডেকে বের করা তো সম্ভবই না, কেউ টেনে বের করতে গেলে তাকে নখের আঁচড়ে ও দাঁতের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। খাবার দাবারের কোন ফিকির নেই। চুপচাপ বাথরুমে বসে থাকে। ইতোমধ্যে নাতীটাকে এনে আমাদের পাশের সোফায় বসিয়ে দিল তার মা। নজরের হিফাযতের স্বার্থে আমরা দু'জনই মস্তকাবনত হয়ে কথা শুনছি। আর মাঝে মাঝে আড় চোখে নাতীর দিকে দেখছি। আমাদের সংকোচ বোধ অনুভব করে তার মা একটু পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মধ্যে নিজ মায়ের কথায় লুকমা দিচ্ছে। বাচ্চাটা বয়সের তুলনায় বেশ বড়সড়, নাদুস নুদুস ও সুশ্রী। খামুশ বসে আমাদের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। তার তাকানো দেখে মনে হল, সে আমাদেরকে মঙ্গল গ্রহের লোক ভাবছে। জন্মের পর থেকে দাড়ি-টুপি ওয়ালা লোক সরাসরি দেখেছে কি না সন্দেহ আছে। জিজ্ঞেস করলাম ওর নানা বেঁচে আছে কি না? বললেন, না, তিনি কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। বললাম, বাচ্চার বাবা কি সন্তানের কোন খোঁজ-খবর নেয় না? বললেন, সে একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। আমরা তার ভাড়া বাসায় চিটাগংয়ে থাকতাম। আমার মেয়েটা স্কলাস্টিকা স্কুলে শিক্ষকতা করত। বিবাহের পর থেকেই তাদের মাঝে তেমন বনিবনা হচ্ছিল না। এরই মাঝে আল্লাহ তাদেরকে সন্তানটি দান করলেন। আশা করেছিলাম এর ওসিলায় তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা ও আস্থার সম্পর্ক তৈরি হবে। কিন্তু উল্টো অবনতি হল। আমার মেয়ে চাকরি করুক এটা সে কখনো চাইত না। পক্ষান্তরে স্বামী লম্বা লম্বা মেয়াদে শীপে থাকবে আর সে শুধু বাসা পাহারা দিবে এটা আমার মেয়ে কিংবা আমি মানতে পারছিলাম না। অবশেষে শীপে ওঠার অজুহাতে সেই যে বাসা ছেড়ে চলে গেছে আজ পর্যন্ত তার কোন খোঁজ নেই। ঢাকার নিজ বাসা ভাড়ায় দিয়ে চিটাগংয়ে ভাড়া বাসায় থাকা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। মেয়েটা ঢাকার স্কলাস্টিকায় বদলির দরখাস্ত দিয়ে আশ্বাস পাওয়ার পরে আমরা চিটাগংয়ের বাসা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসলাম।

কাহিনী আর লম্বা হতে না দিয়ে আমার জানা অনুপাতে কয়েকটি সূরা পড়ে বাচ্চাটাকে কয়েকটি ফুঁক দিয়ে আমরা উঠতে চাইলাম। মা-মেয়ে সমস্বরে অনুরোধ জানালো, আপনাদের জন্য

নাস্তা রেডি আছে। প্লিজ! নাস্তা করে যাবেন। এই বলে পরাটা-মিষ্টি আর গরুর গোশত এনে টেবিলে রাখল। গ্রামের নতুন বৌয়ের মত মাথা ঝুকিয়ে রাখতে রাখতে আমাদের ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে। এখন এ নাস্তা দেখে আমার তলপেটে কেন জানি মোচড় দিয়ে উঠল। ইদরীস ভাই দস্তুরমত খাওয়া শুরু করে দিলেন। তার খাওয়ার কারণও ছিল। সে আরেক কাহিনী, ইদরীস ভাইকে যারা চেনেন তারা সে কাহিনী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল আছেন। এখানে সে কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক বিধায় আর উল্লেখ করলাম না। আমি অতি কষ্টে একটা মিষ্টি খেলাম। তাতেও যেন বমি হওয়ার উপক্রম। এরই মাঝে বৃদ্ধার আরেক আবদার, হুযূর! আমার আরেকটা নাতী এ বিল্ডিংয়েরই ভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকে, তাকেও যদি একটু দম করে দিতেন। আপনি অনুমতি দিলে তাকে নিয়ে আসতে বলি। আমি অসম্মতির কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। বললাম, ঠিক আছে। তিনি ফোনে যোগাযোগ করে বাচ্চাটাকে আনিয়ে নিলেন। বেশ চঞ্চল, চঞ্চলতাই এর সমস্যা। বয়সে ছোট। তার দ্বিতীয় মেয়ের ছেলে। কাউকে মানে না। তার উৎপাতে ঘরের সব লণ্ড-ভণ্ড। নানীর দাবী এটা স্বাভাবিক চঞ্চলতা নয়। নিশ্চয় এর উপর দুষ্টু জিনের আছর আছে। কাজেই একেও ঝেড়ে দিন। আমি ৩৩ আয়াতের আমল করে একেও দম করে দিলাম। জানতে চাইলাম এর বাবা কী করে? বৃদ্ধা জানালেন এ বাচ্চার মা-ও স্বামী পরিত্যক্তা। আরো বললেন, তার আরেকটা মেয়ে অপর একটি ভবনে থাকে। তার বিয়েই হয়নি। তারা নিজেরা কিছু আয়-রোজগার করে তা দিয়ে যার যার মত ভাড়া বাসায় থাকে। আমরা আর কথা না বাড়িয়ে বৃদ্ধার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

পরবর্তীতে তাদের প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে এক দু'জনের সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, এ বৃদ্ধার মেয়েরা মডেলিং পেশায় জড়িত। এদের বাসায় নিয়মিত পরপুরুষের আনাগোনা চলে। এ কারণে বিবাহিত দুটোর স্বামীরা এদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। আর অপরটাকে বিয়ে করতে কেউ সাহস করছে না।

প্রিয় পাঠক! এ হল আমাদের ইসলাম পরিপন্থী জীবনের কুফল। একেকটি সন্তান নিয়ে যুবতী নারী আজ স্বামীহারা। আর যে নারী কুড়িতে বুড়ী হত সে আজ চল্লিশেও কুমারী।

ছেলেরা এসব স্বাধীনচেতা ও চাকুরীজীবি মেয়েদেরকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আর কেউ বিবাহ ছাড়াই নারীদের সঙ্গ লাভের সুযোগ পেয়ে খামাখা সংসারের ঝামেলা কাঁধে নিতে চাচ্ছে না। এভাবে যে একটা সমাজ ব্যবস্থা ক্রমেই অধঃপতনের শেষ সীমায় চলে যাচ্ছে। আর অবলা নারীরা রাস্তা-ঘাটের পরপুরুষদের ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত হচ্ছে এ কথা এদেরকে কে বুঝাবে! কোন কোন কুলাঙ্গার আবার এসব নারীকে পুরুষদের উত্যক্ত করার পরামর্শ দিচ্ছে। এরা কি কখনো সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে? আর পারলেও তাতে তাদের কী লাভ হবে? পুরুষদেরকে তো গর্ভবতী করে ছেড়ে দেয়া যাবে না। শুনেছি পাশ্চাত্যের নারীরা তাদের ভুল বুঝতে শুরু করেছে। ভোগবাদী পুরুষদের ষড়যন্ত্র জাল থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে অনেকেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। আর আমাদের নারীদের ব্যাপারে তাদের মন্তব্য হল, যে অখাদ্য খেয়ে আমরা বমি করতে শুরু করেছি, প্রাচ্যের মেয়েরা আজ সে বমি গিলতে শুরু করেছে। দেরীতে হলেও এ বুঝটুকু যদি আমাদের এ সকল নারীরা মাথায় নিতো তাহলে উক্ত বৃদ্ধার তিনটি মেয়েই সংসার বঞ্চিত থাকতো না। বৃদ্ধার মত আরো কত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যে তাদের আদরের দুলালীদের বৈরাগী ভবিষ্যৎ দেখে চোখের পানি ফেলছেন সে পরিসংখ্যান কী কখনো প্রকাশিত হবে?

আবূ তামীম

মেসার্স রাজিব এন্টারপ্রাইজ

প্রো. হাফেজ মাওলানা রহমতুল্লাহ

সরাসরি সিলেটের ভোলাগঞ্জ ও জাফলং থেকে গুণগত মানসম্পন্ন

পাথর ও সিলেকশন বালু

সরবরাহের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

সিঙ্গেল, বোল্ডার ভাঙ্গা, ভুতু ভাঙ্গাসহ সর্বপ্রকার নির্ভেজাল ও কোয়ালিফাইড পাথর এবং সিলেকশন বালু সুলভ মূল্যে সারাদেশে সরবরাহ করা হয়।

ঢাকা অফিস
৪১/৯ সি হাজী আফসার উদ্দীন লেন
ঝিগাতলা, ধানমণ্ডি, ঢাকা
০১৭১৬৭১০৭১১

ভোলাগঞ্জ অফিস
শাকুরা পাম্পের দক্ষিণে
কোম্পানীগঞ্জ ভোলাগঞ্জ, সিলেট
০১৮১৬৪৩৮৮১২

গ্রন্থ পরিচিতি

তাবলীগে দীন

মাওলানা নূরুল্লাহ নু'মান

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ : ইমাম গাযালী রহ. এর মূল নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ। তিনি হুজ্জাতুল ইসলাম ও গাযালী নামেও পরিচিত। গাযালী উপাধি কোন ভিত্তিতে হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়। *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*-এ ইমাম গাযালী থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাযালা নামক গ্রামের দিকে সম্বন্ধ করে গাযালী উপাধি হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তার পিতা সুতা কাটার কাজ করতেন এবং সুতা বিক্রি করে পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন। তাই গাযালী উপাধি হয়েছে। (ইমাম যাহাবী; তারীখুল ইসলাম)

জন্ম : তিনি খোরাসান প্রদেশের তূস জেলার অন্তর্গত তাবরান নামক শহরে ৪৫০ হিজরী মুতাবিক ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা : ইমাম গাযালী রহ. ও তার ছোট ভাই আহমাদকে তার পিতা ইন্তিকালের সময় একজন বড় ও বিশ্বস্ত আলেমের নিকট সোপর্দ করে বলে দেন যে, আমার ছেলে দুটির ভার গ্রহণ করুন। তারা যেন আপনার তত্ত্বাবধানে থেকে ভবিষ্যতে লেখাপড়া শিখে। যাহোক পিতার মৃত্যুর পর সে বুযুর্গ ইমাম গাযালী রহ. এবং তার ছোট ভাইয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেন। পরে তাদের পিতার সম্পদ কম থাকায় অল্প দিনের মধ্যেই সম্পদ শেষ হয়ে যায়। তারপরেও তিনি বহু কষ্ট সহ্য করে তূস শহরে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ খারকানীর নিকট ফিকহ শাস্ত্রের প্রাথমিক কিতাবগুলোর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর জুরজানে ইমাম আবু নাসের ইসমাঈলীর নিকট উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি আরো উচ্চতর ইলম অর্জন করার জন্য বিভিন্ন দেশে সফর করেন। যেমন, ইরাক, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর শাম ইত্যাদি তিনি ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী জুওয়ানী ও আল্লামা আবু ইসহাক শিরাযীর নিকট যান এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন সমাপ্ত করেন।

কর্মজীবন : ইমামুল হারামাইনের ইন্তেকালের পর তিনি বাগদাদ শহরে অবস্থিত নিযামিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা নিযামুল মুলকের দরবারে যান। নিযামুল মুলক পরপর কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিতর্ক সভার আয়োজন করে তার জ্ঞানের গভীরতা জেনে নেন এবং তিনি সবগুলোতে বিজয়ী হন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে নিজামুল মুলক সালজুকী তাকে মাদরাসায়ে নিযামিয়া বাগদাদ-এ অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন। সেখানে ৪৮৪হি. থেকে ৪৮৮হি. পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। এরপর ৪৯৯ হিজরীতে মাদরাসায়ে নিযামিয়া নিশাপুর-এ এক বছর দরস দান করেন। মাঝে ১০ বছর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকেন।

তিনি ফালসাফা বা দর্শন, বাতেনিয়া, তাসাওউফ ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি মাত্র ৫৫ বছর হায়াতে ছিলেন। তন্মধ্যে সম্ভবত ২০ বছর বয়স থেকে তাসনীফের কার শুরু করেন। জীবনের দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। বাকী ২৪ বছরের মধ্যে তিনি অধ্যয়ন করেন। তা'লীমের কাজও কোন সময় ত্যাগ করেননি। তার ব্যক্তিগত ছাত্রের সংখ্যা কোন সময় ১৫০ এর কম ছিল না। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ফতওয়া ও চিঠি-পত্রের জবাব দিতেন। মাঝে-মধ্যে রাজ দরবারে গুরুত্বপূর্ণ কাজে স্বকীয় অংশগ্রহণ করতে হত। এত কাজ সমাধান করার সাথে সাথে শত শত কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে কতকগুলো আবার একাধিক খণ্ডে বিভক্ত। যেমন, *এহইয়াউ উলূমুদ্দীন*, *কিমিয়ায়ে সাআদাত*, *কিতাবুল আরবাঈন* উল্লেখযোগ্য।

ইন্তিকাল : ইমাম গাযালী রহ. ৫০৫ হিজরী ১৪ই জুমাদাল আখিরাহ তাবরান নামক স্থানে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন এবং তাবরানেই সমাহিত হন।

তাবলীগে দীন পরিচিতি

তাবলীগে দীন মূলত ইমাম গাযালী রহ. এর আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ *কিতাবুল আরবাঈন* এর অনুবাদ। মূল কিতাবের পুরা নাম *কিতাবুল আরবাঈন ফী উসূলিদ্দীন*। ইমাম গাযালী রহ. কিতাবুল আরবাইনের আলোচনা চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. جمل العلوم وأصولها (এই ভাগে আকাইদ সংক্রান্ত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর ১০টি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।)

২. الاعمال الظاهرة (এই ভাগে ইবাদত সংক্রান্ত ১০টি মৌলিক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।)

৩. الاخلاق المذمومة تجب التزكية عنها (এই ভাগে মৌলিক ১০টি দোষ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের অন্তরকে যে দোষগুলো থেকে পবিত্র করা আবশ্যক।)

৪. الاخلاق المحمودة تجب التحلية بها (এই অংশে মৌলিক ১০টি গুণের আলোচনা হয়েছে যে গুণগুলো মানুষের অর্জন করা আবশ্যক।) ইমাম গাযালী রহ. এ চারটি বিষয়কে زبدة علوم القران বলেছেন।

মীরাঠ নিবাসী হযরত মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ. সরল ও প্রাঞ্জল উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করে নামকরণ করেন *তাবলীগে দীন*। অল্প দিনের মধ্যে গ্রন্থটি ভারতের আলেম সমাজে সমাদৃত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা ইমদাদিয়া লাইব্রেরীর মৌলভী হাজী আব্দুল করীম সাহেব সে সময়ের মুহাক্কিক আলেম ও অভিজ্ঞ লেখক দ্বারা *তাবলীগে দীন* বাংলায় অনুবাদ করান। অতঃপর *তাবলীগে দীন* নামেই তা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, উর্দূ এবং বাংলা অনুবাদে মূল কিতাবের চার অংশের মধ্য থেকে শেষ তিন অংশ নেয়া হয়েছে। আর প্রথমাংশের অনুবাদ ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

রচনার উদ্দেশ্য

মানুষ যেহেতু দু'টি জিনিসের সমন্বয়ে গঠিত। রূহ বা আত্মা এবং দেহ তথা শরীর। মানুষ হওয়ার জন্য যেমনিভাবে তার দেহের অস্তিত্বের প্রয়োজন তেমনিভাবে প্রয়োজন তার রূহের। বরং রূহ ব্যতীত শরীরের কোন মূল্য নেই। কেননা একটি দেহ যতই রুগ্ন, দুর্বল হোক না কেন যখন তাতে রূহ থাকে তখন সে দেহের মূল্য মানুষের নিকট থাকে এবং তার সম্মান বহাল থাকে। শারীরিক যেমন রোগ-ব্যাধি হয় তেমনি আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধিও হয়। ফলে উভয়ের চিকিৎসা প্রয়োজন; বরং আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যাধি অধিক ক্ষতিকারক হওয়ার কারণে এর চিকিৎসার প্রয়োজন বেশি। যাতে মানুষ আত্মার রোগ-ব্যাধি নির্ণয় করতে পারে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে এ উদ্দেশ্যে ইমাম গাযালী রহ. গ্রন্থটি রচনা করেন।

গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এটি তাসাওউফের অন্যতম একটি গ্রন্থ। আর তাসাওউফ বলা হয় এমন ইলমকে, যার মাধ্যমে নফসের (আত্মার) পবিত্রতা, পরিশুদ্ধতা, কলবের পরিচ্ছন্নতা এবং নিজের যাহেরী-বাতেনী (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ) অবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে ভালো রাখার এমন কিছু মাধ্যম ও উপকরণ জানা যায় যেগুলোর উপর আমল করলে চিরস্থায়ী সফলতা লাভ করা যায়। আর তাসাওউফ বা আত্মশুদ্ধি অর্জন করা ইজাযতপ্রাপ্ত হক্কানী পীরের সোহবত ও বাইয়াত ছাড়া খুবই দুঃষ্কর। ইমাম আবুল কাসেম রহ. তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *কাশরিয়ায়* লেখেন, আমি আমার উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রহ. কে এটা বলতে শুনেছি যে, যে গাছ নিজে নিজে বড় হয় তার পাতাগুলো যদিও সুন্দর হয় কিন্তু তাতে স্বাদযুক্ত ফল ধরে না এবং পরবর্তীতে তা অযত্নের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ইজাযতপ্রাপ্ত বুযুর্গের সোহবত ছাড়া তাসাওউফ অর্জন করার দ্বারা যদিও সে কিছুদূর অগ্রসর হয় পরবর্তীতে নফসের তাড়নায় সে তার সব আমল শেষ করে দেয় এবং গুমরাহীর পথে পা বাড়ায় ফলে সঠিক পথের দিকে ফিরে আসা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মুনাসেব মত ইজাযতপ্রাপ্ত কোন হক্কানী পীরের সোহবতে থেকে নিজের জীবনকে সুন্দর করা দরকার। আর এজন্য এ ধরনের গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। তাই ইমাম গাযালী রহ. এই গ্রন্থটি রচনা করে আমাদের জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দর ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য করার পথ খুলে দিয়েছেন। হযরত শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. বলেন, ‘ইমামুল-আছর হাকীমুল-উম্মত মোজাদ্দেদুল-মিল্লাত কুতুবুল-এরশাদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ছাহেব রহ. কিতাবখানা বিশেষভাবে পছন্দ করিয়াছেন এবং তদীয় মুরীদানদের পড়িতে উপদেশ দিয়াছেন।’ তিনি আরো বলেন, ‘এই কিতাবের পাঠকগণ পাইবেন– এবাদতকে কেমন করিয়া খাঁটি এবং প্রাণবন্ত এবাদতে পরিণত করা যায় তাহার পন্থাসমূহের সন্ধান ও মুক্তির পথ। আরও পাইবেন– কেমন করিয়া মানবাত্মাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করা যায় তাহার যুক্তিমূলক ও প্রামাণিক ব্যবস্থা।’ (তাবলীগে দীন; ভূমিকা অংশ)

বৈশিষ্ট্য

অনুবাদকৃত অংশের প্রথম খণ্ডে ইবাদত কিভাবে খাঁটি ও ভেজালমুক্ত হয় সে পন্থাসমূহের সন্ধান ও মুক্তির পথ এবং মানবাত্মাকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছানো **(১৯ নং পৃষ্ঠায় দেখুন)**

জোয়ার সাহারা মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম দেশ বরেণ্য আলেম, উস্তাজুল মু‘আল্লিমীন শাইখুল কুর্‌রা

মাও. ক্বারী হোছাইন আহমাদ সাহেব

এর প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায়

নূরাণী মু‘আল্লিম প্রশিক্ষণ কোর্স

৮ই জুন ২০শে শা‘বান হতে ২০দিন

ভর্তি ফি ৫০০টাকা থাকা খাওয়া ফ্রি

বি.দ্র. মেধাবীদের জন্য খিদমতের ব্যবস্থা করা হবে

যোগাযোগঃ মাও. ক্বারী হোছাইন আহমাদ সাহেব দা.বা. মোবা. ০১৭৩৩৯৯২৩৮৪

ইজরার পদ্ধতিতে নাহু-সরফের বিশেষ প্রশিক্ষণ

১লা রমযান থেকে ২০দিন

ভর্তি ফি মাত্র ২০০/- থাকা খাওয়া ফ্রি

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় : মুফতী জামালুদ্দীন রাহমানী সাহেব দা.বা. প্রতিষ্ঠাতা, মুহতামিম অত্র জামি‘আ

সার্বিক যোগাযোগঃ মুফতী আহমাদ মুহিউদ্দীন সাহেব, নায়েবে মুহতামিম মোবা.০১৮৪৮৩৩৫৭০৮

মুফতী ইবরাহীম খলীল সাহেব, নাযেমে তা‘লিমাত মোবা.০১৯৩৪৮২৬৪৭৫

জামি‘আতুল আবরার (কাঁচপুর)

কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

বি.দ্র. ৮ই শাওয়াল হতে সকল বিভাগে ভর্তি চলবে

মেধাবী ও গরীব ছাত্রদের জন্য থাকা খাওয়া ও কিতাবাদীর বিশেষ সুব্যাবস্থা রয়েছে

যাতায়াতঃ যাত্রাবাড়ি থেকে কাঁচপুর ব্রিজের পূর্ব পার্শে, সোনারগাঁও পেট্রোল পাম্পের পিছনে,কাঁচা বাজার সংলগ্ন।

মাতৃজাতি

মহিলাদের মসজিদে গমন ও জামাআতে অংশগ্রহণ

মাওলানা আনওয়ারুল হক

এক

মহিলাদের নামাযের জন্য মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। বর্তমানে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে জোরালোভাবে এ কথাটির প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় যেভাবে মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতেন বর্তমান যামানায়ও তাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করার অনুমতি আছে। কেউ মসজিদে গেলে তা ইসলামী শরীয়তের দাবীর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

দুই

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মসজিদে গিয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতে নামায আদায় করার প্রতি জোর তাকীদ দিয়েছেন এবং বহু ফযীলতের কথা ইরশাদ করেছেন। তাছাড়া মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবনে জামাআতের অনেক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জামাআতের এত গুরুত্ব ও ফযীলত কাদের জন্য? শুধু পুরুষদের জন্য না কি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য?

ফকীহ, মুহাদ্দিসগণের সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা ফরয বা ওয়াজিব আমল নয়। এ ব্যাপারে তাদের প্রতি কুরআন-হাদীসে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়নি। তাহলে তারা কোন উদ্দেশ্যে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে ছুটে যাচ্ছেন? মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে না গিয়ে ঘরে পড়ার মধ্যে বেশি সওয়াব। বেশি সওয়াব অর্জন যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে নারীদের মসজিদের পরিবর্তে ঘরে নামায আদায় করতে অনীহা কেন?

তিন

হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করলে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের যে বক্তব্য ও আমল আমাদের সামনে আসে তা হলো, নারীদের জন্য ঘরে একাকী নামায পড়া সর্বাবস্থায় উত্তম। ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের জামাআতে শরীক হওয়া ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কোনটিই নয়। ফিতনার আশঙ্কার ক্ষেত্রে নারীদের ঘরের বাইরে গিয়ে পুরুষদের জামাআতে অংশগ্রহণ সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে নারীদের মসজিদে গমনের বিষয়টি ইসলামের প্রথম যামানায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য বুঝানোর উদ্দেশ্যে অনুমোদিত ছিল। নিম্নে বিষয়গুলোর প্রামাণ্য আলোচনা তুলে ধরা হল।

মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান তাদের বাসগৃহ

এ সংক্রান্ত কায়েকটি হাদীস,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নিজ স্ত্রীদিগকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ৫৬৭)

عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن.

অর্থ : হযরত উম্মে সালামা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের উত্তম মসজিদ তাদের ঘরের ভেতরের অংশ। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৬৫৪২)

عن عمته أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني أحب الصلاة معك قال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي قال فأمرت فبنى لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل.

অর্থ : উম্মে হুমাইদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ইচ্ছা হয় আপনার পিছনে নামায আদায় করি । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি আমার পিছনে নামায আদায় করতে তুমি আগ্রহী, অথচ তোমার জন্য তোমার ঘরের ছোট কামরায় নামায পড়া বড় কামরার নামাযের চেয়ে উত্তম। বড় কামরার নামায অপেক্ষা ঘরের আঙ্গিনার নামায উত্তম। ঘরের আঙ্গিনার নামায মহল্লার মসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম এবং মহল্লার মসজিদের নামায আমার মসজিদের নামায অপেক্ষা উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, উম্মে হুমাইদ ঘরওয়ালাদেরকে ঘরের অভ্যন্তরে একটি 'নামাযঘর' বানাতে নির্দেশ দেন। সেমতে ভিতরের এক অন্ধকার কোঠায় তার জন্য নামাযের স্থান বানানো হয় এবং তিনি সেখানে নামায আদায় করতে থাকেন। আর এ অবস্থায় তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছেন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭০৯০)

উপরোক্ত সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়,

১. মহিলাদের নামাযের জন্য তাদের নিজ গৃহ যে কোন মসজিদ অপেক্ষা বেশি উত্তম।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই মহিলাদেরকে মসজিদে গমন থেকে নিরুৎসাহিত করেছেন।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থাকে উত্তম বলেছেন তার বিপরীত কাজ উত্তম ও সওয়াবের হতেই পারে না।

মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ

যে সকল বর্ণনা মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝায় তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল,

عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل قلت لعمرة أومنعهن؟ قالت نعم.

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল মহিলারা যেভাবে সাজসজ্জা শুরু করেছে তা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যক্ষ করতেন তাহলে তাদেরকে অবশ্যই মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ

করে দিতেন। যেমন বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৮৬৯)

عن أبي عمرو الشيباني أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول اخرجن إلى بيوتكن خير لكن.

অর্থ : হযরত আবু আমর শাইবানী বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. কে দেখেছি যে, তিনি জুমু'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা নিজ ঘরে চলে যাও, তোমাদের জন্য তাই উত্তম। (আততারগীব ওয়াততারহীব; পৃষ্ঠা ৫২৩)

এ হল নবী যুগের পরপরই মসজিদে গমনকারী মহিলাদের অবস্থার পরিবর্তনে হযরত আয়েশা রাযি. এর উক্তি ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর আমল। যদিও তখনকার মহিলারা ছিলেন সাধারণ জীবন যাপনের শ্রেষ্ঠ নমুনা এবং সাহাবী অথবা তাবেয়ী। পক্ষান্তরে আজ চৌদ্দশত বছর পরে যখন মহিলাদের তেল, সাবান, শ্যাম্পুসহ সকল প্রসাধনী সুগন্ধিযুক্ত। অধিকাংশ মহিলারা পর্দা করে না। এ অবস্থা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলে তাদেরকে মসজিদে গমনের অনুমতি দিতেন এমন ধারণা করা চরম আহম্মকী ছাড়া আর কী হতে পারে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নারীদের মসজিদে গমন সংক্রান্ত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা :

عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها.

অর্থ : হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে আসার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদেরকে নিষেধ করো না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২৩৮)

এ জাতীয় আরো সে সকল হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের মসজিদে গমনে বাধা দিতে স্বামীদেরকে নিষেধ করেছেন, সে সকল হাদীস ইসলামের প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত। তখন নারীরা কোন অন্তরায় ছাড়াই পুরুষদের পিছনে দাঁড়াতো। কোন হাদীসে এ কথার প্রমাণ নেই যে, নারীদের মসজিদে নামায পড়ার জন্য পর্দাঘেরা কোন ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছিল।

ঈদের দিন মহিলাদের ঈদগাহে গমন

মহিলাদের জন্য ঈদের নামায আদায় করতে ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় হাদীস ও তার সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল,

عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين ليجتنبن الحيض مصلى الناس.

অর্থ : হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নাবালিকা, যুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যাতে তারাও ঈদে ও মুসলমানদের দু'আতে শরীক হতে পারে। তবে যাদের ঋতুস্রাব চলমান তারা নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৩০৮)

হযরত উম্মে আতিয়্যা থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীস কুতুবে সিত্তাসহ বহু হাদীসগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে أخرجوا এবং أمرنا ইত্যাদি নির্দেশসূচক শব্দ থাকার কারণে কারো ধারণা হতে পারে যে, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া জরুরী। তারা যদি ঈদগাহে না যায় অথবা তাদের নিয়ে যাওয়া না হয় তাহলে রাসূলের নির্দেশ অমান্য হবে। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে এ নির্দেশ যে কোন অত্যাবশ্যকীয় নির্দেশ ছিল না তা বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। কেননা নাবালক বাচ্চা ও ঋতু চলমান মহিলার উপর নামায নেই এবং এদের ঈদগাহে যাওয়া কেউই জরুরী বলে না। অথচ উক্ত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল, সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম থাকায় সংখ্যাধিক্য প্রকাশের জন্য সবাইকে ঈদগাহে যেতে বলা হয়েছিল। ঈদের নামাযে অংশগ্রহণ আবশ্যক এ কথা প্রমাণের জন্য নয়।

মাযহাব চতুষ্টয়ে মহিলাদের মসজিদে গমন

হানাফী মাযহাব : সকল মহিলার জন্য জামাআত, জুমু'আ, ঈদ ও পুরুষদের মাহফিলে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী।

মালেকী মাযহাব : অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলাদের জন্য জুমু'আয় অংশগ্রহণ করা হারাম।

শাফেয়ী মাযহাব : অতিবৃদ্ধা মহিলা ছাড়া সকল মহিলাদের জন্য জুমুআসহ যেকোন জামাআতে অংশগ্রহণ সর্বাবস্থায় মাকরূহে তাহরীমী।

হাম্বলী মাযহাব : কুশ্রী মহিলা ছাড়া সকল মহিলার জন্য জুমু'আয় অংশগ্রহণ করা মাকরূহে তাহরীমী। (আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ১/৩১১, ৩১২)

প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত আলোচনায় যা পেলাম এর বিপরীতে এমন কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস কিংবা ফিকহী বর্ণনা নেই যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন যুগে মহিলাদের মসজিদে গমন ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিংবা অধিক সওয়াবের কাজ মনে করা হত এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবীগণ কিংবা ফিকাহবিদ ইমামগণ মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেছেন। তাহলে বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে কী করে তা সওয়াবের কাজ হতে পারে? যে সকল নামধারী আলেম বা স্কলারগণ বর্তমানে মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে উৎসাহিত করেন তারা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আয়েশা রাযি. ও ইবনে মাসউদ রাযি. এবং মুজতাহিদ ইমামগণের চেয়েও বেশি যোগ্য ও অনুসরণীয় হয়ে গেলেন! যে সকল তথাকথিত আধুনিক আলেম বেগানা মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে আগ্রহবোধ করেন, যে সকল স্কলার অসংখ্য বেগানা মহিলাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে ইসলামী লেকচার প্রদান করেন কিংবা লক্ষ লক্ষ বেগানা মহিলাদের দেখার জন্য বিনা প্রয়োজনে নিজেকে উপস্থাপন করেন, (অথচ হাদীসের আলোকে এ সবই নিষিদ্ধ; সুনানে তিরমিযী, হা.নং ২৭৮২, সুনানে আবু দাউদ, হা.নং ৪১১২) বাস্তব দীন ইসলামের ক্ষেত্রে কি এরাও গ্রহণযোগ্য?

উল্লেখ্য যে, টার্মিনাল, জংশন, এয়ারপোর্ট ও মুসাফিরদের যাত্রা বিরতির স্থানে অনুরূপ হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় স্থানে মহিলাদের নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা জরুরী। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপট। হারামাইন শরীফাইন ও মক্কা-মদীনার পথে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা মূলত এজন্যই। যেন তাওয়াফ-সায়ীর জন্য আগমনকারীনী, ভ্রমণরত মহিলারা সব সময় নামায পড়ে নিতে পারে। এ সকল স্থানে স্থানীয় আরব মহিলাদেরকে সাধারণত দেখা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা এগুলো দেখে এসে নিজেদের আবাসিক এলাকার মসজিদে মহিলাদের নামাযের ব্যবস্থা রাখার দাবী তোলে। অথচ বালেগ পুরুষদের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআতে শরীক হয়ে পড়া ওয়াজিব এর জন্যও যে কিছু করণীয় আছে তা চিন্তা করে না। বিষয়টি এক প্রকার বিভ্রান্তি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকার গোমরাহী থেকে হিফাযত করুন।

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, মুহাম্মাদপুর

ঈমান-আকাইদ

মিযান সরদার
বরিশাল

৯৯ প্রশ্ন : একজন আলেম যিনি ইমামও বটে, তিনি যদি কোনো ভণ্ড পীরের মাযার যিয়ারত করতে যান, যেমন আটরশীর পীর বা অন্য কোনো ভণ্ড পীর তাহলে তার দীনদারীর কতটুকু ক্ষতি হবে? এবং সাধারণ লোকের মধ্যে এর কি প্রভাব পড়বে?

উত্তর : শুধু মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নয়। হ্যাঁ, কোনো কাজে কোথাও গেলে আর সেখানে কোনো হক্কানী পীরের মাযার থাকলে তা যিয়ারাত করা জায়েয হবে, তবে শর্ত হলো সেখানে কোনো প্রকারের বিদআত বা শিরক না হতে হবে। এমতাবস্থায় হক্কানী পীরের মাযার যিয়ারত করলে তাতে সাওয়াব হবে। কোনো গুনাহ হবে না।

আমাদের জানা মতে আটরশীর মাযারসহ অন্যান্য মাযার বিদআত ও শিরকের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং এই মাযার ওয়ালাদের কেউ কেউ নিজ জীবদ্দশায়ই উম্মতের গোমরাহীর কাজে লিপ্ত ছিল। তাই তারা পীর হওয়া তো দূরের কথা মুসলমান ছিল কি না তাতেই যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যেমন আটরশীর পীরের একটি আকীদা নিম্নে উল্লেখ করছি, 'হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে পারে, তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসবে' (বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সংবাদদাতা) অথচ এই আকীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আকীদা। যে এ কথা বিশ্বাস করবে যে, অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম মানলেই মুক্তি পাবে, তার ঈমানই থাকবে না।

তাই কোনো আলেম বা ইমামের জন্য এ ধরনের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই। কেননা উল্লিখিত মাযারে অনেক ধরনের বিদআত ও শিরকের কাজ হয়ে থাকে। নিজ আকীদায় ও আমলে খারাবী না থাকলেও একজন আলেম ও ইমামের সেখানে সফর করে যাওয়াটা গুনাহের কাজে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করারই নামান্তর। তাই উক্ত আলেমের এই কাজ ঠিক হয়নি। তার উচিত প্রকাশ্যে তাওবা করে নেয়া। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৮৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩২৬, সুনানে ইবনে মাযাহ; হা.নং ১৪০৯, রদ্দুল মুহতার ২/২৪৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২২৪)

ইবাদত

সৈয়দ আহমাদ
ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

১০০ প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে ফজরের আযানের পূর্বে ২০/২৫ মিনিট মাইকে জিকির করা হয়। তারপর নামাযী-বেনামাযী সকলের নাম নিয়ে মসজিদে আসার জন্য ডাকাডাকি করা হয়। এ আমলকে অনেক মুসল্লি ভাল মনে করে। কারণ এর দ্বারা জামাআতে মুসল্লি বেশি হয়। আবার অনেকে খারাপ মনে করে কারণ এর দ্বারা অনেকের নামায, তিলাওয়াত ও যাদের উপর নামায ফরয নয় তাদের কষ্ট হয় এবং নাম নিয়ে ডাকাডাকির কারণে অনেকে লজ্জিত হয়। তাছাড়া আযানের পূর্বে মাইকে দুরূদ শরীফ পড়া হয় এবং অনেকে মসজিদে প্রবেশের পর উচ্চস্বরে সালাম দেয়। এখন প্রশ্ন হল,

(ক) এভাবে জিকির করা ও নাম ধরে ধরে ডাকাডাকি করা বৈধ কি না?

(খ) আযানের পূর্বে মাইকে দুরূদ শরীফ পড়ার হুকুম কি?

(গ) মসজিদে প্রবেশ করার পর উচ্চস্বরে সালাম দেয়ার হুকুম কি? সুন্নাত না বিদআত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : (ক) ফজরের নামাযের পূর্বে মাইকে জিকির করা এবং নামাযী-বেনামাযী সকলের নাম ধরে ধরে ডেকে নামাযের জন্য জাগ্রত করা যদিও বাহ্যত ভালো কাজ মনে হয় কিন্তু এর দ্বারা একেতো মানুষকে অহেতুক কষ্ট দেয়া হয়, দ্বিতীয়ত শরীয়ত নির্ধারিত নিয়মের সাথে মনগড়া পদ্ধতি যুক্ত করা হয়। তাই নিয়মতান্ত্রিক এ কাজ করা নাজায়েয। কারণ শরীয়ত মানুষকে নামাযের প্রতি আহ্বানের জন্য আযান নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন আযানের পূর্বে বা পরে যদি এভাবে জিকির ও ডাকাডাকি করা হয় তাহলে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আযানের কোনো বৈশিষ্ট্য বাকি থাকে না। তাই এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। (সূরা মায়িদা- ৩, সূরা আহযাব- ৫৮, সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৯৩৫, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম; পৃষ্ঠা ২৯৪, রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৬, সিবাহাতুল ফিকরি ফিল জাহরি বিয যিকরি; পৃষ্ঠা ২২, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৯/২০৩)

(খ) দুরূদ শরীফ পাঠ অনেক ফযীলতের বিষয়। কিন্তু শরীয়তের স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোনো বিশেষ সময়ে বা বিশেষ কোনো আমলের সাথে দুরূদ পড়ার নিয়ম বানিয়ে নেয়া বিদআত। বিদআত দ্বারা নেকী হয় না বরং গুনাহ হয়।

আযানের পূর্বে মাইকে দুরূদ পড়াও বিদআত ও নিন্দনীয় কাজ। কারণ হাদীসে আযানের পর দুআর পূর্বে দুরূদ পড়তে বলা হয়েছে। তা না করে আযানের পূর্বে দুরূদ পড়ার নিয়ম বানিয়ে নেয়া শরীয়ত গর্হিত কাজ। কুরআন-হাদীস ও ফিকহের কোনো কিতাবে এ আমলের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এ আমল বর্জন করা সকলের কর্তব্য। (সহীহ বুখারী; হা.নং ২৬৯৭, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম; পৃষ্ঠা ২৩৩, আল কওলুল বাদী ফিসসালাতি আলাল হাবীবিশ শাফী; পৃষ্ঠা ৫৩৩, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৬৯, ফাতাওয়া দারুল উলূম ২/১০২)

(গ) কারো নামায বা তিলাওয়াতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হওয়ার শর্তে মসজিদে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে সালাম দেয়া যাবে। কিন্তু মসজিদে সাধারণত নামায, যিকির ও তিলাওয়াতে মশগুল লোকজন থাকেই। আর উচ্চস্বরে সালাম দিলে এসব লোকের ব্যক্তিগত আমলে বিঘ্ন ঘটার আশংকা তৈরি হয়। তাই প্রবেশের পর সবাইকে সালাম না দিয়ে যাকে অবসর পাবে তাকে আস্তে করে সালাম দিবে। (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৪/২৬৮৫, আল ফিকহুল হানাফী ফী সাওবিহিল জাদীদ ১/৬১৬, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১৭/২১১)

মাওলানা সুলাইমান
যশোর

১০১ প্রশ্ন : (ক) এক জায়গায় পৌঁছার দু'টি পথ আছে, একটি সড়ক পথ আরেকটি নৌপথ। এক পথ হিসাবে শরঈ সফরের দূরত্ব হয় আরেক পথ

হিসাবে শরঈ সফরের দূরত্ব হয় না। এ অবস্থায় কোন পথের বিবেচনায় নামায রোযা ইত্যাদি আদায় করবে? আর যদি একাধিক সড়কপথ এমন থাকে যার একটি দিয়ে গেলে সফরের দূরত্ব হয় আর অপরটি দিয়ে গেলে সফরের দূরত্ব হয় না, সেক্ষেত্রে কোন পথ বিবেচনা করা হবে?

(খ) নদীপথে কত কি.মি. চলার দ্বারা মুসাফির গণ্য হবে?

উত্তর : (ক) যদি কোনো স্থানে পৌঁছার একাধিক সড়ক পথ কিংবা একাধিক নৌপথ থাকে। অথবা একটি স্থলপথ আরেকটি নৌপথ থাকে। যার একটিতে সফরের দূরত্ব হয় আর অপরটিতে হয় না। তাহলে সফরকারী যে পথে সফর করছে সেই পথের বিবেচনায় সে মুকীম বা মুসাফির গণ্য হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া **১**/১৯৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২২৮, ফাতাওয়ায়ে খানিয়া **১**/১৬৪, ইমদাদুল আহকাম **১**/৭২১)

(খ) নৌপথে কী পরিমাণ দূরত্বের সফরের নিয়তে সফর শুরু করলে মুসাফির সাব্যস্ত হবে এ সম্পর্কে 'যাহিরুর রেওয়া'তে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তা হল, 'স্থল পথের সফরের দূরত্ব পরিমাণ সফরের নিয়তে সফরে বের হলে মুসাফির সাব্যস্ত হবে'। আর এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তিনদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিরতিসহ মধ্যম গতিতে ভ্রমণ করলে যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায় ঐ পরিমাণ দূরত্বের সফরের নিয়তে বের হলে মুসাফির সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এই তিন দিনের দূরত্ব বর্তমান সময়ের দ্রুতগামী নৌযানের হিসাবে ধরা হবে না। বরং স্বাভাবিক আবহাওয়ায় হস্তচালিত নৌকার পথচলা হিসাব করা হবে। আর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্বাভাবিক আবহাওয়ায় সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মধ্যম গতিতে বিরতীসহ নৌকা চালালে ১৬ মাইলের বেশি পথ অতিক্রম করা যায় না। সে হিসাবে নদীপথে সফরের দূরত্বও ১৬×৩=৪৮ মাইল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। (শরহুল আইনী **১**/৯৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২২৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া **১**/১৩, জাওয়াহিরুল ফিকহ **১**/৪৩৬)

শাবীব আব্দুল্লাহ

রংপুর

১০২ প্রশ্ন : শবে মি'রাজে বিশেষ কোনো নামায-রোযা বা ইবাদত আছে কি না?

উত্তর : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের জীবনে মি'রাজ একটি অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা যার আলোচনা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকের মধ্যে করেছেন। তেমনি স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, যা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে।

কিন্তু কুরআনে পাকের কোনো আয়াতে কিংবা নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসে মি'রাজ রজনীকে কেন্দ্র করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাস কোনো ইবাদত বা নামায রোযার হুকুম করেছেন বলে প্রমাণিত নেই এবং মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার পরও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক বছর দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন, কিন্তু কখনো তিনি উক্ত রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদত করেননি।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম রাযি. প্রায় একশত বছর দুনিয়াতে বেঁচে ছিলেন, তাঁরাও কখনো উক্ত রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদত করেননি। আর দিনের বেলায় রোযাও রাখেননি। বরং কিছু লোক রোযা রাখতে চাইলে হযরত উমর রাযি. তাদেরকে বেত্রাঘাত করে রোযা ভাঙতে বাধ্য করেছেন। এ ঘটনা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে তাবেয়ী তাবে তাবেয়ীন ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনও উক্ত রাতকে বিশেষ কোনো ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করেননি। আর মাযহাব চতুষ্টয়ের নির্ভরযোগ্য কোনো ফিকহের কিতাবেও শবে মি'রাজকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো ইবাদতের কথা বর্ণিত নেই।

সুতরাং উক্ত রাত্রিকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোনো নফল নামায পড়া এবং অনেক রাত পর্যন্ত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতে থাকা, দিনের বেলায় রোযা রাখা বিদআত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসন্তুষ্টির কারণ।

واما ليلة الاسراء فلم يأت فى ارجحية العمل فيها حديث صحيح ولا ضعيف ولذالك لم يعينها النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا عينها أحد من الصحابة بأسناد صحيح ولا صح الى الان ولا الى ان تقوم الساعة فيها شيء...

(সূরা হাশর- ৭, সূরা আলে ইমরান ৩১, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ২৬৭৬, লাতাইফুল মাআরিফ; পৃষ্ঠা ১৭৩, মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ ২/৪৩১, শরহুয যুরকানী ৮/১৮)

মুআমালাত

মাহমূদ

পাইকগাছা, খুলনা।

১০৩ প্রশ্ন : রাশেদ, খালেদ, মাজেদ আর বশীর এই চারজন মিলে একটি সমিতি করেছে। তারা ঠিক করেছে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ কিছু অর্থ সমিতির কোষাগারে জমা করবে এবং জমাকৃত অর্থ দিয়ে খালেদের মাধ্যমে একটি ব্যবসা করাবে। ব্যবসায় শুধু খালেদ শ্রম দিবে। অন্য তিনজন শুধু অর্থ বিনিয়োগ করবে। এখন প্রশ্ন হল,

ক. উল্লিখিত পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি না?

খ. বৈধ হলে ব্যবসার অর্জিত মুনাফা সবার মাঝে কী হারে বন্টিত হবে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় আপনাদের ব্যবসাটি যৌথ মূলধন নির্ভর ব্যবসা। শরীয়তে এ ধরনের ব্যবসার সুযোগ রয়েছে। তবে ব্যবসা শুরু করার পূর্বেই প্রত্যেকের মুনাফার হার নির্ধারণ করে নিতে হবে। ব্যবসায় যেহেতু শ্রমদাতাসহ সকলের অর্থই খাটবে তাই শ্রমদাতার জন্য কিছু বেশি নির্ধারণ করে বাকি তিনজনের জন্য সমহারে মুনাফা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেমন, শ্রমদাতার জন্য ৪০% আর বাকি তিন জন ২০% করে মোট ৬০%।

উল্লেখ্য, লাভটা অংশ হারে (যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে) নির্ধারণ করতে হবে; নির্দিষ্ট কোনো অংকের মাধ্যমে (যেমন, লাখ প্রতি দুই হাজার, তিন হাজার ইত্যাদি) নির্ধারণ করা জায়েয হবে না। আর ব্যবসায় ক্ষতি হলে প্রত্যেককে নিজ মূলধন অনুপাতে ক্ষতির ভাগ বহন করতে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ২০৩৩১, আল-বাহরুর রায়েক ৫/২৯২, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২২০, রদ্দুল মুহতার ৪/৩১৩)

মামুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১০৪ প্রশ্ন : ক. আমি জনৈক ব্যক্তিকে ২০০০/- টাকা ঋণ দিলাম। বর্তমান বাজার মূল্য হিসাবে এ টাকা দ্বারা ৪০ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। আমি ঋণ গ্রহিতাকে বললাম এক বছর পর ফেরৎ দিলেই চলবে। ইত্যবসরে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ায় উক্ত টাকায় এখন ২৫ কেজি খাদ্যশস্য পাওয়া যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। ঋণ ফেরত নেয়ার সময় যদি আমি ৩২০০ টাকা পেতাম তাহলে আমি পূর্বের ন্যায় ৪০ কেজি শস্য কিনতে পারতাম। এ ক্ষেত্রে শরীয়তের ফায়সালা কি? আমি

তাকে এহসান করলাম; তার থেকে সুদ হিসাবে অতিরিক্ত কিছু নিলাম না। কিন্তু আমি ক্ষতিগ্রস্ত কেন হব?

আবার দাম যদি কমে যায় সেক্ষেত্রে ধরা যাক উক্ত টাকা পরিশোধের সময় তা দ্বারা ৫০ কেজি শস্য পাওয়া যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার জন্য (২০০০ টাকার কম) ৪০ কেজির দাম ১৬০০ টাকা দেয়া ঠিক হবে কি না?

খ. আমাদের হল চত্বরে সুপারি, জাম্বুরা, জামরুল ইত্যাদির অল্পসংখ্যক গাছ আছে। কর্তৃপক্ষ সাধারণত এসব গাছের কোনো তদারকি করে না বা খোঁজ-খবর রাখে না। তাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনাও নেই। ফলমূল হলে তা পড়ে নষ্ট হয় অথবা হলের সাধারণ ছাত্র বা ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা তা পেড়ে নেয়। এমতাবস্থায় এসব ফল খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয হবে কি?

গ. আমাদের হলকর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে হিটার ব্যবহারের অনুমতি নেই। স্যাররা হিটার দেখলে জব্দ করে নিয়ে যান। হিটার ব্যবহার করে রান্নাকৃত খাবার খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ক. প্রশ্নোক্ত উভয় সূরতে আপনি ঋণগ্রহিতা থেকে ২০০০ টাকাই পাবেন। খাদ্যশস্যের দাম বাড়ায় বা কমায় ঋণের টাকা পরিশোধে কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না। এটাই শরীয়তের বিধান। কেননা কাউকে ঋণ দেয়া উক্ত টাকা নিজের কাছেই রেখে দেয়ার নামান্তর। নিজের কাছে রেখে দিলে যেমন পণ্যের দাম কমা-বাড়ার সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না, তেমনি কাউকে ঋণ দিলেও পণ্যের মূল্যের ভিত্তিতে তাতে কোনো কম-বেশি করা যাবে না। কম-বেশি করলেই তাতে সুদের প্রসঙ্গ এসে যাবে। তবে হ্যাঁ কেউ যদি উক্ত সমস্যা এড়াতে চায় তাহলে নগদ টাকা ঋণ দিবে না। ঐ টাকার পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ঋণ দিবে এবং পরবর্তীতে সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ফেরৎ নিবে। (কিতাবুল আসল, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ৩/১৭, রদ্দুল মুহতার ৫/৭১৯, আল মাবসূত লিস্‌সারাখসি ১৪/৩৭, আল মুহীতুল বুরহানী ৭/২৪৯, ফিকহী মাকালাত ১/৪৯)

খ. যদি কর্তৃপক্ষের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকে এবং ফল হলে তা পড়ে নষ্টই হয়, তাহলে এমন ঝরে পড়া ফল আপনাদের জন্য খেতে কোনো অসুবিধা নেই। গাছে থাকা ফল পেড়ে খাওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি আবশ্যক। আপনারা পেড়ে খেতে চাইলে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিবেন। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৪১৮, আল মুহীতুল বুরহানী ৬/১৯৪, রদ্দুল মুহতার ৬/৪৩৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২৩/৩৭৯)

গ. কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যেহেতু হিটার ব্যবহারের অনুমতি নেই, তাই আপনাদের জন্য হিটার ব্যবহার করা বৈধ হবে না। বরং বিনা অনুমতিতে হিটার ব্যবহার করলে গুনাহ হবে। তবে হিটারে রান্নাকৃত খাবার খাওয়া অবৈধ বা নাজায়েয হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৯/৩৩৪, ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম; পৃষ্ঠা ১২৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৪৭, ফাতাওয়া উসমানিয়া ৩/৪৮)

আসাদুজ্জামান
টঙ্গি, গাজিপুর।

১০৫ প্রশ্ন : বাংলাদেশের সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সময় শপথবাক্য পাঠ করতে হয়। সেখানে বলতে হয়, 'আমি প্রজাতন্ত্রের প্রতি অনুগত থাকব'। প্রশ্ন হল, বাংলাদেশ একটি অনৈসলামিক প্রজাতন্ত্র। তাই এর প্রতি আনুগত্যের শপথ করা জায়েয হবে কি না? ঐ চাকুরী করাই বা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : দেশের নাগরিক হিসাবে বৈধ কাজের চাকুরী করার অধিকার সবারই রয়েছে। আর চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকার শরীয়তসম্মত যেসব শর্ত আবশ্যকীয় করেছে অবশ্যই তা মানতে হবে। কারণ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের কাজের আদেশ না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মানতে হবে।'

আপনার দাবী 'বাংলাদেশ একটি অনৈসলামিক প্রজাতন্ত্র' কথাটি পরিপূর্ণ ঠিক নয়। কারণ বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রজাতন্ত্র। যদিও সংবিধানের কিছু বিষয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক, কিন্তু ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অধিকাংশ নিয়ম-কানুন শরীয়তসম্মত। অতএব, সরকারী চাকুরীতে যোগদানের সময় নিয়োগপত্রে লিখিত শপথবাক্য পাঠ করে চাকুরী করা জায়েয আছে। তবে যেসব বিষয় শরীয়তবিরোধী সেসব বিষয়ে সরকারের আনুগত্য করা জায়েয হবে না এবং শপথের সময়ও সেগুলো পালন করার নিয়ত করবে না। (সূরা বাকারা- ১৭২, সুরা জুমুআ- ১০, সহীহ বুখারী; হা.নং ২০৫৯, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭০৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৯১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১/২৮৯, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২০/৩৮১)

সালাম শেখ
গোপালগঞ্জ

১০৬ প্রশ্ন : (ক) fixed asset যেমন কমার্শিয়াল বিল্ডিং (দোকানের পজিশন বিক্রি করা মার্কেট এবং ভাড়া দেয়া বাসা) থেকে বাৎসরিক যে ভাড়া আসে সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়-ব্যয় বাদ দিয়ে যা সঞ্চয় থাকে তার উপর যাকাত আসবে, নাকি fixed asset এর বর্তমান মূল্য ধরে তার যাকাত দিতে হবে?

(খ) নিজের বব্যহৃত গাড়ীর উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কি না?

(গ) ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত ট্রাকের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় কি না?

(ঘ) কমার্শিয়াল বিল্ডিং তথা মার্কেট নির্মাণ করার জন্য জায়গা ক্রয় করে বিল্ডিং নির্মাণ পর্যন্ত যে খরচ হয়, সেই খরচের টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? পরবর্তীতে দোকানের পজিশন বিক্রি করে যে টাকা আসবে, তার যাকাত আদায় করলেই হবে, নাকি মার্কেট নির্মাণের জন্য যে খরচ করা হচ্ছে তার উপর যাকাত দিতে হবে?

(ঙ) ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে জায়গা ক্রয় এবং বিভিন্ন ট্রেডিং ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ট্রেডিং ব্যবসার মাল বিক্রি করে ব্যাংকের দায় পরিশোধ করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকই বেশি টাকা পাবে। কারণ কিছু টাকা জায়গা ক্রয়ে ব্যয় হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে ব্যাংকের দেনা পুরোপুরি শোধ করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে কিভাবে যাকাত নির্ধারণ করা হবে?

(চ) ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করলে তার উপর যাকাতের বিধান কি?

(ছ) বিশ বছর যাবত বিভিন্ন সময়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত স্বর্ণের মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করতে হবে?

উত্তর : (ক) fixed asset তথা কমার্শিয়াল বিল্ডিং, দোকানের পজিশন বিক্রি করা, মার্কেট এবং ভাড়া দেওয়া বাসা থেকে যে ভাড়া আসে সেখান থেকে প্রাপ্ত আয়া-ব্যয় বাদ দিয়ে যা সঞ্চয় থাকে তার উপর যাকাত আসবে। fixed asset এর বর্তমান মূল্যের উপর যাকাত আসে না।

(খ), (গ) নিজের জন্য ব্যবহৃত গাড়ী এমনিভাবে ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত গাড়ীর মূল্যের উপরও যাকাত আসে না।

(ঘ) মার্কেট নির্মাণের উদ্দেশ্যে জায়গা খরিদ ও বিল্ডিং নির্মাণ বাবদ যে খরচ হচ্ছে তার উপর যাকাত আসবে না। বরং জায়গা ও প্লানসহ মার্কেটের যতটুকু কাজ সম্পন্ন হয়েছে ততটুকুর বর্তমান বাজার মূল্য যা দাঁড়ায় তার উপর যাকাত আসবে।

(ঙ) প্রশ্নোল্লিখিত সূরতে উক্ত ব্যবসার মালের উপর যাকাত আসবে না। কারণ

তা ঋণ পরিশোধে খরচ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ জায়গা-জমি যদি ব্যবসার নিয়তে খরিদ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার মূল্যের উপর যাকাত আসবে।

(চ) শিল্প ঋণ নিয়ে ঘর নির্মাণ করা হলে বা মেশিনারী ক্রয় করা হলে উক্ত ঘর ও মেশিনের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে অন্যান্য যাকাতযোগ্য মালের মূল্য হতে উক্ত শিল্প ঋণ বাবদ নেয়া অর্থ বাদও দেয়া হবে না। বরং অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।

উল্লেখ্য, সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করা হারাম। তাই এ কাজ থেকে বেঁচে থাকা চাই।

(ছ) প্রশ্নোল্লিখিত স্বর্ণের মূল্য বর্তমান বাজারে ব্যবহৃত স্বর্ণের বিক্রয় মূল্য হিসেবে নির্ণয় করে তার যাকাত দিতে হবে। চাই বর্তমান বাজার মূল্য ক্রয় মূল্য থেকে কম হোক বা বেশি। (সূরা বাকারা- ২৭৫, সুনানে তিরমিযী ১/২২৯, মাআরিফুস সুনান ৬/১৪০, রদ্দুল মুহতার ২/২৬৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৯৫, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬/৯৫৪)

বিবিধ

শাহনুর রহমান
সাতক্ষীরা

১০৭ প্রশ্ন : নিত্যদিনের খাদ্য তালিকায় মুরগি একটি উপাদেয় খাদ্য। জনৈক আলেম বলেছেন, 'মুরগির গলার ভেতরের সাদা রগ খাওয়া হারাম এবং সে রগ বের না করে তরকারি রান্না করলে তরকারিও হারাম হয়ে যাবে।' এ বক্তব্য প্রমাণে তিনি ফাতাওয়া মাহমূদিয়ার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল, মুরগির গলার রগ সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক কি না? এবং ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়ার উদ্ধৃতিই বা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : মূল জবাবের আগে জবাবটি বোঝার জন্য হারাম ও মাকরূহে তাহরীমীর সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘি, পনির এবং বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হালাল হল যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন, আর হারাম সেই জিনিস যা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হারাম করেছেন। আর যে জিনিসের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নীরব থেকেছেন অর্থাৎ কিছু বলেননি তা মাফ অর্থাৎ তা মুবাহ।' (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৭৩০, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩৩৬৭, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের)

হারাম ও মাকরূহে তাহরীমীর মানদণ্ড সম্পর্কে শাইখ আব্দুল কারীম যাইদান বলেন, 'যেসব বিষয় হারাম হওয়ার পিছনে অকাট্য দলীল রয়েছে সেগুলো হারাম, দলীল যদি যন্নী হয় তাহলে তা মাকরূহে তাহরীমী। এটাই ফিকহে হানাফীর অভিমত। (আল-ওজীয ফী উসূলিল ফিকহ; পৃষ্ঠা ৩৪) শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেন, ' হারাম হল, যার নিষেধাজ্ঞা সন্দেহাতীত অকাট্য দলীল (যেমন, কুরআনের আয়াত এবং মুতাওয়াতির হাদীস) দ্বারা প্রমাণিত, আর মাকরূহে তাহরীমী হল, যার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে এমন যন্নী দলীল রয়েছে যাতে শুবহা রয়েছে , (যেমন মুতাওয়াতির ছাড়া অন্য সব গ্রহণযোগ্য হাদীস)' ফাতহু বাবিল ইনায়াহ-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এই ভূমিকা দ্বারা বোঝা গেল, কুরআন কিংবা মুতাওয়াতির হাদীসের দলীল ছাড়া কোনো জিনিসকে হারাম বলা যাবে না। আর মাকরূহে তাহরীমী বলতে গেলেও তার পক্ষে কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস লাগবে। মুরগির গলার রগ খাওয়া হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী হওয়ার পক্ষে কুরআনের আয়াত, মুতাওয়াতির হাদীস কিংবা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য হাদীস নেই। অতএব, মুরগির গলার রগকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী বলারও কোনো সুযোগ নেই। ফাতাওয়া মাহমূদিয়ায় উক্ত রগকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী যাই বলা হোকনা কেন তার পক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে কোনো দলীল উল্লেখ করা হয়নি। বরং তাহতাবী রহ. কর্তৃক প্রণীত আদ্দুররুল মুখতার গ্রন্থের টিকায় বর্ণিত একটি দুর্বল বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম তাহতাবী প্রাণীর হারাম এবং মাকরূহ অঙ্গসমূহের বর্ণনার পরে বলেন, وزيد نخاع الصلب 'গলদেশ থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত রগকেও (হারাম ও মাকরূহ অঙ্গের তালিকায়) বৃদ্ধি করা হয়েছে।' তিনি এ মতটি খুব দুর্বলভাবে উল্লেখ করেছেন (সীগায়ে তামরীয ব্যবহার করে) এবং এ মতের পক্ষে কুরআন-হাদীস থেকে কোনো দলীলও উল্লেখ করেননি। অতএব, শরীয়তের যথাযথ দলীল ছাড়া শুধু ফিকহের দুর্বল একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করে মুরগির গলার রগকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী বলার কোনো সুযোগ নেই।

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে প্রাণীর হারাম ও মাকরূহ অঙ্গসমূহের আলোচনায় কোথাও উক্ত রগের কথা উল্লেখ করা হয়নি। প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে শুধু সাতটি অঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা, প্রবাহিত রক্ত, পুরুষ লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, মূত্রথলী, অণ্ডকোষ, রোগের কারণে চামড়ার নিচের টিউমার সদৃশ গোশত, পিত্ত। ফকীহগণ এই সাতটির মধ্যে শুধু প্রবাহিত রক্তকে হারাম বলেছেন আর বাকি ছয়টিকে মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। (দেখুন, আন্নুতাফ ফিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ১৫১, বাদাইউস সানায়ে ৬/২৭২, তাবয়ীনুল হাকায়েক ৭/৪৬৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৩৫৮, মাজমাউল আনহুর ৪/৪৮৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৭৪৯, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ ৫/১৫২)

এসব কিতাবে উক্ত রগের কথা উল্লেখ না থাকার দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হয় যে, মুরগির গলার রগ হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী নয়। কেননা ফুকাহায়ে কেরামের স্বীকৃত নীতি হল, ফিকহের ক্ষেত্রে মাফহূমে মুখালেফ (বিপরীত দিক) গ্রহণযোগ্য হয়। (উসূলুল ইফতা; পৃষ্ঠা ৪৭৪) তাই মাকরূহ অঙ্গসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে উক্ত রগের কথা উল্লেখ না করাই তা হালাল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যা হোক এ ব্যাপারে আমাদের শেষ কথা তাই যা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী রহ. বলেছেন। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'নিসাবুল ইহতিসাব এবং মাতালিবুল মুমিনীন কিতাবের বাহ্যিক ইবারত থেকে বোঝা যায়, গলার রগের কারাহাত তানযীহী পর্যায়ের (অর্থাৎ সেটা খাওয়া অপছন্দনীয়), মাকরূহে তাহরীমী নয়। সুতরাং যে প্রাণীর উক্ত রগ বের করা কঠিন সে প্রাণীর ঐ রগ বের করা জরুরী নয়।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া ২/২৬৫ উর্দূ)

যেহেতু মুরগির গলার রগ হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী হওয়াই প্রমাণিত নয়, তাই উক্ত রগসহ রান্নাকৃত তরকারী হারাম হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

উল্লেখ্য, কোনো কোনো ফকীহ এটাকে মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন সূরা আ'রাফের ১৫৭ নং আয়াতের 'খাবায়েস'-এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে। দেখুন, বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৪৫, আল কিফায়া ১/৯৫, ফাতহুল কদীর ১/৯৬, ইমদাদুল মুফতীন ২/৯৭০। তাই সতর্কতা হিসেবে উক্ত রগ না খাওয়া ভাল, কিন্তু এটাকে হারাম বা মাকরূহে তাহরীমী বলা যাবে না।

কিশোর প্রতিভা

এখনো দেখা হলো না সেই পুষ্পটিকে

পরীক্ষার ছুটি শেষে সবেমাত্র দরস শুরু হয়েছে। পড়ালেখাও এগিয়ে চলছিল নতুন উদ্যমে। কিন্তু এরই মাঝে হঠাৎ একদিন সংবাদ এল, 'তোমার মেজো বোনের জীবনোদ্যানে একটি পুষ্প ফুটেছে। ব্যস্ততার কারণে সংবাদ পৌঁছানো যায়নি। তবে আগামী শুক্রবার তার নাম রাখা হবে তুমি ছুটি নিয়ে চলে এসো'। সংবাদটি শোনামাত্রই মনটি আনন্দে নেচে উঠল। আবেগাপ্লুত হৃদয় ফুটন্ত পুষ্পটিকে দেখার আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু লেখাপড়ায় বিঘ্ন হবে ভেবে আগ্রহ সত্ত্বেও পুষ্পটিকে আর দেখা হল না। আম্মুকে জানিয়ে দিলাম, তোমরা আমার প্রতীক্ষায় থেকো না, আমি আসতে পারছি না। তবে দু'আ করি, রব্বে কারীম যেন আমার অদেখা সালমান নামের সেই ছোট্ট ভাগ্নেকে কবুল করে নেন। তোমাদের সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন। বিশ্ববাসী যেন এই পুষ্পরাজ থেকে পুষ্পঘ্রাণ আহরণ করেন। আমীন। আর ছোট্ট সালমানকে বলবে, তোমার মামা তোমাকে দেখতে আসেনি বলে মন খারাপ করো না। তুমি বড় হবে মানুষের মত মানুষ হবে, দেখবে তখন তোমাকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ছুটে আসবে আজীবন। তাই, এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরণে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন। তোমার কাছে আমাদের এটাই প্রত্যাশা।

আতীকুল্লাহ (কুমিল্লা)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

মা তুমি দূর পারাবারে...

মা! তুমি ছাড়া পৃথিবী নিষ্ঠুর। যার মা নেই তার যেন কিছুই নেই। কখনো ভাবিনি, হঠাৎ আমাকে ছেড়ে এভাবে চলে যাবে তুমি ওপারের দেশে।

আমার ছেলেবেলায় আমাকে নিয়ে তুমি স্বপ্ন দেখতে, আমাকে আলেম বানাবে। তুমি হবে আলেমের গর্বিত মা। আমাকে নিয়ে তোমার কত স্বপ্ন, কত আশা। কত ভরসা, কত গর্ব এবং কত প্রত্যাশা ছিল! তোমার সে স্বপ্ন যখন পূরণের পথে, তোমার কাঙ্ক্ষিত আশা যখন বাস্তবায়নের শেষ মুহূর্তে ঠিক তখনই তুমি চলে গেলে। দেখা হল না তোমার স্বপ্নের শেষ। একদিন রান্না করার সময় অসতর্কতার হঠাৎ শাড়ির আঁচলে আগুন ধরে যায়। সবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার শরীরের অনেকাংশ পুড়ে যায়। দুই সপ্তাহ হাসপাতালে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। যখন মায়ের মুখে সুস্থতার রেখা ফুটে উঠতে শুরু করল আমরা আশায় বুক বাঁধলাম, হয়তো আমরা আমাদের মাকে ফিরে পাবো। আবার আম্মু বলে ডাকতে পারবো। দুশ্চিন্তা কেটে গিয়ে আমাদের আশা ক্রমেই বেড়ে চলছিল। আর ঠিক তখনই মা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেলেন পরপারে। কেউ ভাবিনি া এভাবে হঠাৎ করেই তিনি চলে যাবেন। আমরা আর তাকে মা বলে ডাকতে পারবো না। মা চলে গেছেন আজ অনেক দিন। তবুও যখনই মাকে মনে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠি। চোখের জলে বুক ভেসে যায়। বন্ধুরা তোমরা আমার মায়ের জন্য দু'আ করো, আল্লাহ যেন আমার মরহুমা আম্মাজানের নেক আশা পূর্ণ করেন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন।

মি'রাজুল ইসলাম (খুলনা)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

বসন্ত রাণীর কানের দুল

টানা ১১দিনের পরীক্ষার চাপে দেহ-মনে দুঃসহ একঘেয়েমি চেপে বসেছে। অবসাদ-ক্লান্ত শরীরটাকে একপ্রকার জোর করেই কুমিল্লার বাসে তুলে নিলাম। ঢাকার সীমানা পেরোতেই মনে হল, বাতাস যেন ক্রমেই তরল হয়ে আসছে। অনুভব করলাম মনের সঙ্গে শরীরটাও কেমন হালকা হালকা লাগছে। রাস্তার আইল্যান্ডে শানবাঁধানো গাছের সারি। ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় পাতাগুলো ঝিরিঝিরি দুলছে। সেই সাথে দুলছে আমার মন, দুলছে পুরো প্রকৃতি।

দীর্ঘ তিনমাস পর ঘরে ফেরা। বাড়ির আঙ্গিনায় পা রাখতেই একটা অচেনা ঘ্রাণ একেবারে 'নাকের ভিতর দিয়া মর্মে পশিল'। পরীক্ষা আর পথের ক্লান্তি এক নিমেষে কোথায় যে উবে গেল!

সকালে ঘুম থেকে উঠেই পেয়ে গেলাম বাড়ি মৌ মৌ করা গন্ধের উৎস। উঠোনের পশ্চিম কোণে পড়ে আছে এক গাদা ঝরা ফুল। জাম্বুরার সাদা ফুলগুলোকে আমার মনে হল, বসন্ত রাণীর নাকের ফুল, কানের দুল...

আসাদুল্লাহ মাহমূদ
জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া।

জীবনের পাতা থেকে ; প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা

২০০২ খ্রিস্টাব্দের কথা। হযরত আতহার আলী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী জামি'আ ইসলামিয়া মোমেনশাহী মাদরাসার মকতব বিভাগে ভর্তি হই। দুই বছরে মকতব নাযেরা ও তিন বছরে হিফযুল কুরআন সমাপ্ত করি। তারপর শুরু হয় কিতাব বিভাগের আসল লেখাপড়া। পড়ালেখা ভালোই চলছিল। ইতোমধ্যে হিফয বিভাগের কিছু সহপাঠী ঢাকায় চলে আসায় মনে এক রকমের অস্থিরতা, শূন্যতা ও ব্যথা অনুভব করতে থাকি। এভাবেই লেখাপড়ার বেশ কয়েকটি বছর কেটে যায়। আমার দিনরাতের ফিকির তখন একটাই– কীভাবে আমি রাজধানীর কোন ঐতিহ্যবাহী মাদরাসার তালিবে ইলম হতে পারব। আমার আশা ও প্রতীক্ষার মাঝে আল্লাহ তা'আলা আলোর সঞ্চার করলেন। কোন এক প্রভাতের মিষ্টি রোদ ও স্নিগ্ধ আলোর উপভোগ্য মুহূর্তে সংবাদ পেলাম, আমার খালাতো বোনের বৈবাহিক সম্পর্ক হয়েছে রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী রাহমানিয়া মাদরাসার এক শিক্ষকের সঙ্গে। মায়ের মুখ থেকে এই সংবাদ শোনার পর থেকেই রাহমানিয়ার প্রতি আমার ঝোঁক ও আসক্তি বেড়ে যায়। শুধু ভাবতে থাকি, কী করে আমি রাহমানিয়ার ছাত্র হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারব?

নতুন সেই দুলাভাইয়ের সাথে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি আমাকে তারিখ জানিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। অবশেষে দাখেলা ইমতিহানের জন্য রাহমানিয়ায় চলে আসি। পরীক্ষা শেষে ফলাফলের জন্য রাহমানিয়ায় অবস্থান করছি। বিকেলে হঠাৎ দেখতে পেলাম মাদরাসার গেইট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকছে। পূর্ণ সুন্নতী লিবাস পরিহিত, নূর উদ্ভাসিত চেহারার একজন বুযুর্গ উস্তাদ গাড়ি থেকে বের হয়ে দফতরের দিকে হেঁটে চলছেন। পরীক্ষার ফলাফল এখনো প্রকাশ হয়নি। কিন্তু আমার স্বপ্ন জগতে আরেকটি স্বপ্ন যুক্ত হল, কবে এমন এক মহান উস্তাদের ছাত্র হতে পারব? সকালে ফলাফল প্রকাশ হল, কিন্তু আমার নাম আসেনি। সকল স্বপ্ন যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ফোন করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে মাকে

জানালাম। তিনি সান্ত্বনা দিলেন। তাকদীরে যা ছিল তাই হয়েছে। পরবর্তী বছর আবার পরীক্ষা দিলাম। এবার আমার নাম এলো।

রাহমানিয়ার ছাত্র হতে পেরে আমি অনেক খুশি ও আনন্দিত হলাম। কয়েক বছরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুফতী সাহেব হুযূর দা.বা. এর প্রত্যক্ষ ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্যও দান করলেন। মুফতী সাহেব হুযূরের অসংখ্য ছাত্র তা'লীম ও তাদরীসের মাধ্যমে মুসলমানদের দীনী শিক্ষা ও তাহযীব-তামাদ্দুনের সঠিক সংরক্ষণ ও প্রসারে নিয়োজিত। অসংখ্য ছাত্র দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে এবং দাওয়াতুল হকের সুবাদে সমাজের মুসলমানদের মাঝে আখলাক ও নববী আদর্শ তৈরির কাজে নিয়োজিত। অসংখ্য ছাত্র দাওয়াতুল ইসলামের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান বাণী ও সর্বোত্তম আদর্শ পথভোলা মানুষের সামনে তুলে ধরায় নিয়োজিত।

আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে কবুল করুন। আমাকেও ঐ সমস্ত সৌভাগ্যশীলদের কাতারে যুক্ত করুন এবং মুফতী সাহেবের দীনী খিদমত আরো আম করে তাঁর ছায়া আমাদের উপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া।

খতমে বুখারী শরীফ ও মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

আপনি হয়ত অনেক লোকের সমাগম দেখেছেন, বর্ণাঢ্য অনেক আয়োজন দেখেছেন। কিন্তু অনাড়ম্বর পরিবেশেও চেতনা-বিশ্বাসের সমন্বিত উচ্ছ্বাসে হাজারো মানুষের যে সমাগম হতে পারে সেটা হয়ত কখনো দেখেননি। এতে ছিল হৃদয়ের উত্তাপ, প্রাণের সাড়া, কান্নার মাধ্যমে সুপ্ত আকুতি প্রকাশের বিরল দৃশ্য। জামি'আতুল আবরার রাহমানিয়ার খতমে কুরআন ও খতমে *বুখারী শরীফ* উপলক্ষে অনুষ্ঠান ও দু'আর আয়োজন। আজ মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. এর দরস প্রদানের মাধ্যমে *বুখারী শরীফের* আনুষ্ঠানিক খতম। পূর্বকাল থেকে পরীক্ষিত আমল- *বুখারী শরীফের* খতমের পর দু'আ কবুল হয়। দু'আ কবুলের এমন বরকতময় মজলিসে কে না চায় উপস্থিত হতে!

মূল অনুষ্ঠান আসরের পর। আমরা সাইনবোর্ড থেকে জুমার পূর্বে রওয়ানা হই। মুফতী সাহেব হযরতের পেছনে জুমু'আ পড়ার আলাদা একটা তৃপ্তিবোধ কাজ করছিল। জুমু'আর দিন ঢাকা শহরে যানজট থাকলেও আজ তেমন ছিল না। অল্প সময়ে পৌঁছে যাই মুহাম্মাদপুর। আমাদের গাড়িটা যখন বেড়িবাঁধ থেকে বসিলা অভিমুখে চলল, রাস্তার মোড়ে দেখতে পেলাম সরল নূরানী চেহারার দাঁড়িয়ে থাকা কিছু তালিবে ইলম। আগত মেহমানদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে এবং পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মূল রাস্তা থেকে মাদরাসা যাওয়ার রাস্তায়ও একই নিয়মে তারা দাঁড়িয়ে আছে। এভাবে মাদরাসা পর্যন্ত রাস্তার প্রতিটি মোড়ে প্রতিটি বাঁকে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। দৃশ্যটা ছিল খুবই উপভোগ্য আনন্দঘন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হল মসজিদুল আবরার। মসজিদটি উন্নত রুচিবোধ ও শিল্পবৈচিত্রের অনন্য নিদর্শন। প্রায় এগার কাঠা জায়গার উপর পাঁচতলা মসজিদটি সাক্ষ্য দিচ্ছে এখনো সে নতুনত্ব কাটিয়ে উঠেনি। জামি'আ রাহমানিয়ার মহান ব্যক্তিবর্গ এর বিস্তৃত কর্মফলের কারণে অবশ্যই একদিন ঐতিহ্যের সুউচ্চ শিখরে অবস্থান করবে। এর মধ্যে যাদের অবদান, অনুদান রয়েছে নিশ্চয় তারা ধন্য ও গর্বিত। এই মুহূর্তে আমরা নিজেদেরকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছি। গাড়িতে আমি যার সাথে বসে আছি তিনিও এই মসজিদে রেখেছেন অসামান্য অবদান। জুমু'আর পূর্বে মুফতী সাহেব হযরত বয়ান করলেন। কথাগুলো বিক্ষিপ্ত হলেও প্রতিটি কথাই ছিল তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ। সাধারণ মানুষকেও দেখেছি গভীর আগ্রহ নিয়ে এমনভাবে ওয়াজ শুনছে, যেন মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাওয়ার সুসংবাদ অথবা মৃত্যুদণ্ডের ভীতিকর ফরমান শুনছে। দুপুর পৌনে দুইটায় হযরতের ইমামতিতে জুমু'আ আদায় করলাম। আর হযরতের তেলাওয়াত যারা শুনেছেন অবশ্যই ভিন্ন তৃপ্তি ও স্বাদ অনুভব করেছেন। নামাজ শেষে মুফতী সাহেব হযরত এলান করলেন, যাদের সময় আছে একটু বসবেন। একটি মাসআলা শুনানো হবে। এলান শুনে আমি কিছুটা হতাশ হয়েছিলাম। মানুষকে বিভিন্ন অফার সুযোগ সুবিধা দিয়েও যেখানে বসানো যায়না, সেখানে মাসআলা শুনানোর কথা বললে কি কেউ বসবে? বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধীর আগ্রহে লোকেরা সামনে এগিয়ে বসতে শুরু করল। ভীড়ের কারণে চেষ্টা করেও আমি সামনে বসতে পারিনি। বাদ জুমু'আ মেহমানদারীর পর বাদ আসর থেকে শুরু হল মূল কর্মসূচি। অনুষ্ঠানের নাম খতমে বুখারী হলেও প্রথমে কয়েকজন ছাত্রের মাধ্যমে কুরআন শরীফের খতম করা হল। কারণ অনেক মানুষ কুরআন শরীফ খতমের চেয়ে বুখারীর খতমকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছে। অনেকে আবার অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে বুখারী ছাড়া অন্য কোন কিতাবের হাদীস মানবে না বলে ঘৃণ্য শক্তির সহায়তা করছে। খতমে কুরআনের পর বুখারী শরীফের শেষ হাদীস পড়ার পর্ব। হাদীসের ছাত্রটি মুফতী সাহেব হযরত থেকে হাদীসের সনদ শুরু করেছে। সনদে বর্ণিত প্রায় আটাশজন ব্যক্তির নাম উচ্চারণের সময় সে যত উপরের স্তরে উঠছিল শরীর ও মনে ততই শিহরণ অনুভব করছিলাম। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে হাদীসের শব্দ বলা হচ্ছিল তখন নিজের অজান্তে চোখের পাতা ঝাপসা হয়ে আসল। এমন মুহূর্তে চোখের পানি ফেলে কী তৃপ্তি তা সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

সনদ মতন ও হাদীস সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে মুফতী সাহেব হযরত দোয়ার জন্য হাত উঠালেন। দোয়াপ্রার্থী হাজারো মানুষের কান্নার রোল, দৃঢ় বিশ্বাসে প্রার্থনা, আবেগী পরিবেশটাকে আরো গম্ভীর করে তুলছিল। প্রতি মুহূর্তে বাড়ছিল কান্নার আওয়াজ।

আহমাদ মুহিউদ্দীন
জামি'আতুল আবরার দা' ওয়াতুস সুন্নাহ, নারায়ণগঞ্জ।

শোকর গোযারী

(আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর, রাবেতার কিশোরপ্রতিভা বিভাগে লেখকদের কাছ থেকে আমরা প্রচুর সাড়া পাচ্ছি। রাবেতাকে আপন ভেবে যারা লেখা পাঠানোর কষ্টটি স্বীকার করছেন তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ। কিশোর প্রতিভা পাতাটি আসলে কোন নির্দিষ্ট বয়সের ইঙ্গিত প্রদান করে না। কিছু নবীন লেখক– লেখালেখির ক্ষেত্রে এখনো যাদের কোন মুরুব্বীর শিষ্যত্ব গ্রহণের সুযোগ হয়নি– সীমিত সাধ্য অনুযায়ী তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য। এভাবে যদি কিছু সংখ্যক নবীনও এ ময়দানের সিপাহসালার হওয়ার স্বপ্ন দেখেন এবং অতঃপর কোন বটবৃক্ষের নিরাপদ ছায়ায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত হোন এটাকেই আমরা পরম সাফল্য জ্ঞান করবো। -বিভাগীয় সম্পাদক)

রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার পক্ষ হতে

মাহে রমাযানের সওগাত

১৪৩৬ হিজরী মুতাবেক ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের
(ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য)

সাহরী ও ইফতারের সময়সূচী

রমাযান	ইংরেজি তারিখ	বার	সাহরীর শেষ সময়	ফজরের আযান শুরু	ইফতার
			রহমত		
০১	১৯ জুন	শুক্রবার	৩-৩৮	৩-৪৪	৬-৫২
০২	২০ জুন	শনিবার	৩-৩৮	৩-৪৪	৬-৫২
০৩	২১ জুন	রবিবার	৩-৩৮	৩-৪৪	৬-৫৩
০৪	২২ জুন	সোমবার	৩-৩৯	৩-৪৫	৬-৫৩
০৫	২৩ জুন	মঙ্গলবার	৩-৩৯	৩-৪৫	৬-৫৩
০৬	২৪ জুন	বুধবার	৩-৩৯	৩-৪৫	৬-৫৩
০৭	২৫ জুন	বৃহঃবার	৩-৩৯	৩-৪৫	৬-৫৩
০৮	২৬ জুন	শুক্রবার	৩-৪০	৩-৪৬	৬-৫৩
০৯	২৭ জুন	শনিবার	৩-৪০	৩-৪৬	৬-৫৩
১০	২৮ জুন	রবিবার	৩-৪১	৩-৪৭	৬-৫৩
			মাগফিরাত		
১১	২৯ জুন	সোমবার	৩-৪১	৩-৪৭	৬-৫৩
১২	৩০ জুন	মঙ্গলবার	৩-৪২	৩-৪৮	৬-৫৩
১৩	০১ জুলাই	বুধবার	৩-৪২	৩-৪৮	৬-৫৪
১৪	০২ জুলাই	বৃহঃবার	৩-৪২	৩-৪৮	৬-৫৪
১৫	০৩ জুলাই	শুক্রবার	৩-৪৩	৩-৪৯	৬-৫৪
১৬	০৪ জুলাই	শনিবার	৩-৪৩	৩-৪৯	৬-৫৪
১৭	০৫ জুলাই	রবিবার	৩-৪৪	৩-৫০	৬-৫৪
১৮	০৬ জুলাই	সোমবার	৩-৪৪	৩-৫০	৬-৫৪
১৯	০৭ জুলাই	মঙ্গলবার	৩-৪৫	৩-৫১	৬-৫৪
২০	০৮ জুলাই	বুধবার	৩-৪৫	৩-৫১	৬-৫৪
			নাজাত		
২১	০৯ জুলাই	বৃহঃবার	৩-৪৬	৩-৫২	৬-৫৩
২২	১০ জুলাই	শুক্রবার	৩-৪৬	৩-৫২	৬-৫৩
২৩	১১ জুলাই	শনিবার	৩-৪৭	৩-৫৩	৬-৫৩
২৪	১২ জুলাই	রবিবার	৩-৪৮	৩-৫৪	৬-৫৩
২৫	১৩ জুলাই	সোমবার	৩-৪৮	৩-৫৪	৬-৫৩
২৬	১৪ জুলাই	মঙ্গলবার	৩-৪৯	৩-৫৫	৬-৫৩
২৭	১৫ জুলাই	বুধবার	৩-৪৯	৩-৫৫	৬-৫৩
২৮	১৬ জুলাই	বৃহঃবার	৩-৫০	৩-৫৬	৬-৫২
২৯	১৭ জুলাই	শুক্রবার	৩-৫০	৩-৫৬	৬-৫২
৩০	১৮ জুলাই	শনিবার	৩-৫১	৩-৫৭	৬-৫২